# সম্পাদকীয়

এক, দুই, তিন, চার ... নয় সংখ্যা অতিক্রম করে ''সাঁকো''র দশম সংখ্যাও প্রকাশিত হল সময় মত। সাঁকোর এই পথচলার অভিজ্ঞতা আমাদের মধ্যে আশা জাগাচ্ছে যে, 'দশক' সংখ্যার উচ্চতা অতিক্রম করে 'শততম' সংখ্যার ''সাঁকো'' একদিন প্রকাশ পাবে আরও পরিপূর্ণতার সম্ভার সাজিয়ে। ভাবনায় আছে, একবার যখন দেরির পাঠ চুকিয়ে এই পত্রিকা প্রকাশের একটা ধারাবাহিকতা আনা সম্ভব হয়েছে, তখন ''সাঁকো''কে বাৎসরিক সংখ্যায় আবদ্ধ না রেখে সান্মাষিক বা ত্রৈমাসিক সংখ্যায় রূপান্তরের, যদিও এরজন্য প্রকাশনাকে কেন্দ্র করে দীর্ঘমেয়াদী স্থায়ী উদ্যোগের ভাবনা চিন্তাও বিশেষ জরুরী হয়ে পড়েছে।

টেম্পার কারখানার দীর্ঘ ৩৬ বছরের পথচলায় আপনজনের সংখ্যা বহুত্বের সীমারেখাকে লঙ্ঘন করে চলেছে প্রতিদিন। আবার প্রাকৃতিক নিয়মে অনেক আপনজন আমাদের ছেড়ে চলেও গেছেন, ব্যতিক্রম ঘটেছিল একমাত্র গতবছরই। যা নবম সংখ্যার সম্পাদকীয়তে বিশেষভাবে উল্লেখিতও হয়েছিল। কিন্তু এবছর বেশ কিছু অকাল প্রয়াণ আমাদের হৃদয়ে বড় বেদনাময় হয়ে আঘাত করেছে। প্রথমজন পঙ্কজ ঘোষ গত ১৯শে মার্চ আমাদের মধ্যে থেকে চলে গেলেন। ওনার সাথে পরিচয় আমাদের পথচলা শুরুর আগে থেকে। তপনদা ও কণকদার দাদার মত ছিলেন। ''গণশক্তি''তে যুক্ত থাকার সূত্রে নিজ জীবনে প্রাচুর্য্যের কোনও স্থান না থাকলেও অনুজের প্রতি দায়বদ্ধতায় তাঁর কোনও ঘাটতি হয়নি। তপনদার স্মরণ সভায় বাজে শিবপুরের মানিকদা, চিল্লুদাদের নিয়ে হাজির ছিলেন। মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করছি সেদিন তাঁর উপস্থিতি আমাদের বিশেষ ভরসা জুগিয়েছিল। এরপরের জন শক্তিপদ মৈত্র। শক্তিদা, যদুমিত্র লেনে আমাদের পথ চলা শুরুর একসাথী। তাপ প্রক্রিয়াকরণ কারখানার শুরুতে তাঁর উপস্থিতি শুনেছি নানান কৌতুক রসের জন্ম দিয়েছিল। 'বরফ গরম হয়ে গেছে'র মত কিছু বিষয়ে আজও চর্চা হয়। কারখানার ব্যাঙ্ক ঋণ এর ক্ষেত্রে ওনার জমিও 'বন্ধক' দিয়েছিলেন। একজন ব্যাঙ্ক কর্মচারী হিসাবে পরবর্তীকালে ওই ঋণ পরিশোধ অনিয়মিত হয়ে পড়ায় উনি খুবই চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন সাময়িকভাবে। তবে পরবর্তীকালে ওই ঋণ সম্পূর্ণ পরিশোধের সংবাদ পেয়েই সাধুবাদ দিতে কারখানায় চলে এসেছিলেন। সেই বোধহয় শেষবার, সাঁকোর বাৎসরিক অনুষ্ঠানের শুরুর দিকে নিয়মিত উপস্থিত থাকতেন। তাঁর একমাত্র কন্যার বিবাহের কিছুদিনের মধ্যে তার শরীরে মারণ ক্যান্সার রোগ ধরা পরে। চারপাশে গোপনীয়তা বজায় রেখে ওনার কন্যা ও জামাতা সাধ্যমত চেষ্টা করলেও সেই প্রচেষ্টাকে বিফল করে শক্তিদাও গত ৩০শে অগাষ্ট আমাদের মধ্যে থেকে চিরকালের জন্য হারিয়ে গেছেন। পরের ঘটনা আরও আকস্মিক। অজয়দার (অজয় মল্লিক) গত ৩০শে নভেম্বর হঠাৎ জীবনাবসান হয়। এবারেও ১১ই নভেম্বর সাঁকোর দ্বাদশ বাৎসরিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বীরেন্দ্রমঞ্চে বৌদিকে নিয়ে হাজির ছিলেন। গত কয়েক বছরের বাৎসরিক অনুষ্ঠানগুলিতে 'সমৃদ্ধ গান'-এর চর্চার অভাব প্রকাশ পেয়েছিল তাঁর কথায়। অজয়দা সাঁকোর লেখকও ছিলেন। এবার সাঁকোতে গান নিয়ে কিছু লিখবেন বলে ঠিকও করেছিলেন। তিনি বলতেন—''গানের মধ্য দিয়েই হৃদয়ের অভিব্যক্তি পূর্ণতা পায়।'' তিনি সরকারী কর্মচারী আন্দোলনেরও একজন অগ্রণী কর্মীও ছিলেন। আত্মসমালোচনাকে খুবই গুরুত্ব দিতেন। তাঁর দেহদানের মধ্য দিয়ে অজয়দার পরিবারবর্গ তাঁর অন্তিম অঙ্গীকারকে সঠিকভাবে মর্যাদা দান করেছেন। গত ৯ই ডিসেম্বর বাড়িতে স্মরণ সভায় তাঁর ভালোলাগা গান ও কথার মধ্য দিয়ে তাকে স্মরণ করে সভাটিকে এক অন্য মাত্রায় পৌঁছে দেওয়া হয়। পত্রিকা প্রকাশের ঠিক আগে আমাদের প্রিয় সীতেনদা (সীতেন সিকদার)কে হারালাম গত ৫ই ডিসেম্বর। ১৯৯১ এর পরে যাঁরা এসেছেন তাদের কাছে বিশেষ পরিচিত না হলেও, শিক্ষাসূত্রে বি.ই. কলেজের ওই প্রাক্তনী ও ওই কলেজেরই ছাত্র সংসদের নির্বাচিত সভাপতি (১৯৬৫-৬৬ বর্ষে) আমাদের কর্মউদ্যোগের সর্ববৃহৎ (বর্তমানে বন্ধ) উইং, সিভিল-এর একজন সক্রিয় সদস্য ছিলেন। তার সাথে আমাদের ঘনিষ্টতা হয়েছিল পেশাদারী কাজের সূত্রে। উপরের সবকজনই সত্তরের কমে চলে গেলেন এবং একমাত্র শক্তিদা বাদে বাদবাকী সবাই তাদের স্ব স্ব ক্ষেত্রে সক্রিয় ছিলেন শেষ দিন পর্যন্ত। 'সাঁকো' পরিবারের পক্ষ থেকে ওনাদের সকলের পরিবারের প্রতি রইল বিনম্র সমবেদনা।

শুধু পরিচিতির সীমাবদ্ধতার বাইরেও যাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন না করলে এই সম্পাদকীয় অসম্পূর্ণ থেকে যাবে তাঁদের মধ্যে শৈলেন মান্নার অবদান বাংলার ফুটবল ময়দানে স্বর্নাক্ষরে লেখা থাকবে। এ বছর ২৭শে ফেব্রুয়ারী এই কিংবদন্তি ফুটবলারের জীবনাবসান হয়। ক'দিন আগে আইলীগে মোহন বাগান-ইস্টবেঙ্গলের খেলাকে কেন্দ্র করে যে কলঙ্কময় ঘটনা ঘটে গেল তাতে ফুটবলে নিবেদিত প্রাণ শৈলেন মান্নার মত মানুষদের অভাব বোধ করছিলাম। এ বছরই আমরা হারালাম এক দেশ বরেণ্য সন্তান ও স্বাধীনতা সংগ্রামী ডঃ লক্ষ্মী সায়গলকে গত ২৩শে জুলাই। নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বোসের তৈরি ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি-র ''ঝাঁসী বাহিনী''র সর্বাধিনায়িকা ও পরবর্তীকালে জ্যোতি বসুর ডাকে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)-র আজীবন সদস্যা ডঃ সায়গল জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত দরিদ্র মানুষের সেবায় তাঁর প্রাণ নিবেদন করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে বোধহয় কানপুর শহরে সর্ববৃহৎ শোক মিছিল হয়েছিল তাদের প্রিয় ''আম্মা''কে শেষ বিদায় জানাতে। আমরা এবছরই হারালাম ''ইন্ডিয়ান পিপলস থিয়েটারের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এ. কে হাঙ্গালকে। শহীদ ভগৎ সিং-এর ভাবশিষ্য এবং চলচ্চিত্র ও মঞ্চের প্রখ্যাত অভিনেতা শ্রীহাঙ্গাল আজীবন

ছিলেন বাম মনোভাবাপন্ন এক আদর্শ পুরুষ। দেশভাগের আগে তার কর্মজীবন শুরু হয়েছিল বর্তমান পাকিস্তানের করাচিতে এক দর্জির দোকানে। গত ২৬শে আগস্ট ওনার জীবনাবসান হয়। রবীন্দ্র পরবর্তী যুগে যখন একঝাঁক দিক্‌পাল লেখক বাংলার সাহিত্য সম্ভারকে সমৃদ্ধ করেছিলেন কবিগুরুর ঘরানার আঙ্গিকে, ঠিক সেই সময় বাংলা সাহিত্যের অঙ্গণে উপস্থিত হয়েছিলেন কফি হাউসে আড্ডা মারা একদল যুবক বাঙালীর সাহিত্য স্বাদের একঘেয়েমিকে কাটিয়ে অন্য কিছু করার তাগিদে। এনাদের মধ্যে থেকেই আমরা পেয়েছিলাম অনেকের মতে কবিগুরুর সাহিত্য প্রতিভার প্রকৃত উত্তরাধিকারী শ্রী সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়কে। কি উপন্যাস, কি কবিতা, কিংম্বা ছোটদের জন্য অমর সৃষ্টিতে তাঁর বিচরণ ভূমির সীমারেখা টানা যাবে না কোনও ভাবেই। তাঁর লেখা উপন্যাস ''সেই সময়'' ''প্রথম আলো'' ''পূর্ব-পশ্চিম'', গোয়েন্দা গল্পের ''কাকা বাবু'' আর কাব্যের ''নীরা'' সাহিত্য পিপাসু বাঙালী মননে আজীবন অম্লান হয়ে থাকবে। বিভক্ত বাংলার ব্যাথাকে আজীবন সঙ্গী করে পথ চলা বামপন্থায় বিশ্বাসী সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন গত ২৩শে অক্টোবর দূর্গাপূজার নবমীর রাতে। ১২ই ডিসেম্বরে খবর পেলাম যে পণ্ডিত রবিশঙ্কর আর নেই। ভারতীয় মার্গ সঙ্গীতের সাথে প্রাচ্যের সঙ্গীতের মেলবন্ধন ঘটিয়ে সঙ্গীত উপস্থাপনার যে আধুনিক রূপ ফুটিয়ে তুলেছিলেন তা সঙ্গীত সাধনার জগতে এক অমর সৃষ্টি। তাঁর অমর সৃষ্টিগুলোর মধ্যে উৎপল দত্তের নাটকে অঙ্গার ও ফেরারী ফৌজ, সত্যজিৎ রায়ের চলচ্চিত্রে পথের পাঁচালি, অপরাজিত এবং পরশ পাথরগুলি অন্যতম। চল্লিশের দশকে যখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ও ফ্যাসিবাদের অভ্যুদয়ের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিরোধে মানুষের মধ্যে ভাবাদর্শগত যে আবেগ তৈরী হয়েছিল, সেই সময় আই.পি.টি.-এর হয়ে ইক্‌বালের লেখা 'সারে জাহাঁসে আচ্ছা' সহ একাধিক গানে সুরারোপ করেও আমাদের মধ্যে তাঁর চিরস্থায়ী স্থান তৈরি করে গেছেন। শুধু সেতারের মূর্চ্ছনাই নয় দাদা উদয়শঙ্করের সাথে পণ্ডিতজি নৃত্যশিল্পী হিসাবে বহু দেশও ভ্রমণ করেছেন এক সময়। ভেবেছিলাম এখানেই বোধ হয় শেষ হবে এবারের স্মৃতিচারণা। কিন্তু সম্পাদকীয় প্রুফ দেখতে দেখতে ২০শে ডিসেম্বর খবর পেলাম যে দেশের হকি জগতের দিক্‌পাল শ্রী লেস্‌লি ক্লডিয়াস আমাদের মধ্যে আর নেই। তিনটি স্বর্ণ পদক সহ চারটি অলিম্পিক পদক জয়ী ক্লডিয়াসের নাম ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে এক 'সন্ন্যাসী' ক্রীড়া সাধক হিসেবে।

এবার কঠিন বাস্তবে ফেরা যাক্‌। বিগত এক বছরে সাধারণ মানুষের কাছে পরিস্থিতি আরও অসহনীয় হয়ে উঠছে। মহিলারা আক্রান্ত হচ্ছেন, খাদ্যের অভাবে গ্রামে আত্মহত্যার ঘটনা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে রাজ্যে খাদ্যে স্বয়ং সম্পূর্ণ জেলা বর্ধমানেই এই ক' মাসে ৫০ জনের উপর কৃষক আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়েছেন। শিক্ষা ক্ষেত্রে নৈরাজ্য ৭০ দশককেও বোধ হয় লজ্জায় ফেলতে চলেছে। ডেঙ্গু-শিশু মৃত্যু সারা রাজ্যে ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। চুরি ডাকাতি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে মানুষ আতঙ্কে বাড়িতে আটকে পড়ছেন একদিকে আর অন্যদিকে উচ্ছেদের ফলে গৃহহীনের সংখ্যাও বাড়ছে। রাজ্যের শিল্পের ভবিষ্যত ক্রমেই অনিশ্চিত হয়ে পড়ছে। যে হলদিয়া শিল্পের আশা জাগিয়েছিল তারও 'পরিবর্তন' হয়ে যাচ্ছে। হলদিয়া বন্দর, পেট্রোকেমিক্যালস্‌ ক্রমেই বন্ধের দিকে এগোচ্ছে। সমাজের সর্বক্ষেত্রে অন্ধকার আরো গাঢ় হয়ে উঠছে। সমাজ বিরোধীরা উৎসাহিত বোধ করছে, ফলে তাদের বিচরণ বা দাপাদাপি বেড়েই চলেছে। এই মুহূর্তে রাজ্যের সরকার বা প্রশাসন নীরব দর্শকের ভূমিকায়। এসবের ফলে মানুষও অসহায় বোধ করছেন। পিছিয়ে আসার জায়গাও সীমিত হচ্ছে। ফলে এগোবার সংকল্প দানা বাঁধছে। এসবই নিজেদের অভিজ্ঞতার সাথে মিলছে। গত অর্থিক বছর আমরা আবার পিছু হাঁটতে শুরু করেছিলাম পরিস্থিতির চাপে। আমাদের মোট কাজ প্রায় ২০% কমে গেছিল। মূলত কারখানায় কাজের মন্দার ফলে। কিন্তু এবারে কারখানার তাপ প্রক্রিয়াকরণের মন্দা প্রায় চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছলেও বাকী ক্ষেত্রে অগ্রগতি হয়েছে সম্মিলিত প্রচেষ্টায়। বিরল কিছু স্বীকৃতি অর্জিত হয়েছে। ১৯৯৯ সালে Central Boiler Board-এর Competant Organisation for Residual Life Assessment অর্জন করতে ব্যর্থ হয়েছিলাম, তা দীর্ঘ প্রায় ১৩ বছরের চেষ্টায় আমরা অর্জনে সক্ষম হলাম গত ২৯শে জুন। পাশাপাশি ২০০১ সাল থেকে অলোকদার (অলোক দত্ত) নেতৃত্বে যে নাট্যচর্চা শুরু হয়েছিল, তা আমরা আমাদের সীমিত ক্ষমতার মধ্যে দাঁড়িয়েও কিছুটা এগিয়ে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছি। এ বছরই কটকে আয়োজিত সর্বভারতীয় স্তরে একটি প্রতিযোগিতায় কয়েকটি বিভাগে আমরা পুরস্কার লাভ করেছি। বিভিন্ন সময়ে কঠিন পরিস্থিতির মুখেও টিঁকে থাকা এবং ঘুরে দাঁড়ানোর অভিজ্ঞতা আবারও আমাদের আত্মবিশ্বাসী করছে সমাজের এই অবক্ষয় ও নৈরাজ্যকে রুখে আলোর সন্ধানে এগিয়ে যাবার। স্যাবীদা (ডাঃ সব্যসাচী সেনগুপ্ত)—ডাঃ গড়াই-ডাঃ অম্বরীশ মহাপাত্র— দময়ন্তী সেনদের দৃঢ়তা, হলদিয়া পৌরনির্বাচন, দুবরাজপুরের ঘটনা, সিমলার মেয়র নির্বাচন, ফেব্রুয়ারী ও সেপ্টেম্বরের হরতাল, মারুতি কারখানার লড়াই, দিল্লীতে শ্রমিকদের মিছিল, আমেরিকার ওয়াল স্ট্রীটের ঘটনা, অলিম্পিকে চীনের সফলতা, ভেনিজুয়ালার হুগো সাভেজের চতুর্থবার বিজয়, হিগ্‌স-বোসন কণা বা ঈশ্বর কণার আবিষ্কার প্রভৃতি ঘটনা আমাদের বিশ্বাসকে আরো কিছুটা মজবুত করছে। সময়ের এই সন্ধিক্ষণে আমরা আর নিজেদের অন্ধকারের অন্তরালে আবদ্ধ না রেখে, আসুন সবাই মিলে নৈরাজ্যের এই নাগপাশের বন্ধন থেকে মুক্তো হতে চেষ্টা করি, না হলে মায়া সভ্যতার কল্পনা মতে ২১.১২.২০১২-তে পৃথিবী ধ্বংস না হলেও বিশ্বায়ণের নৈরাজ্য বা লুঠের ফলে পৃথিবীর ধ্বংস ত্বরান্বিত হবে।

**সাঁকো, ৩৯/৩ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কোলকাতা-৭০০ ০০৪ হইতে প্রকাশিত ও লেজার ম্যাট কর্তৃক মুদ্রিত।**



2nd 2

# সূচীপত্র

## কবিতা


| | | |
|---|---|---|
| উর্দিতে থাকো | *পল্লব বরণ পাল* | ৫ |
| পরিবারের ভালবাসা | *অনুশ্রী শর্মা* | ৫ |
| ইচ্ছে | *কৃশাণু ভট্টাচার্য্য* | ৫ |
| ইউ.এস.এ. সিনড্রোম | *তাপস দাস* | ৬ |
| দৃশ্যনাট্য | *স্বপন দত্ত* | ৬ |
| একটা ঝাপসা আলো | *সূর্য শেখর চক্রবর্তী* | ৬ |
| হে আমার প্রাজ্ঞ সময় | *তাপস দাস* | ৭ |
| এক টুকরো গদ্য | *অনিন্দিতা ভৌমিক* | ৭ |
| নারী | *শুভ্রা পাল* | ৭ |
| ভিজে গেছে..... | *দীপ্তপ্রকাশ চক্রবর্তী* | ৮ |
| সুন্দর হে | *দীপ্তপ্রকাশ চক্রবর্তী* | ৮ |
| নিরুত্তর ছবি | *দীপ্তপ্রকাশ চক্রবর্তী* | ৮ |
| আঁধারমণি | *দীপ্তপ্রকাশ চক্রবর্তী* | ৮ |
| স্মৃতি | *সিদ্ধার্থ দত্ত* | ৯ |
| ইন্দ্রজাল | *দীপঙ্কর নারায়ণ ঘোষ* | ৯ |
| চুপকথা | *ডা. নির্মাল্য রায়* | ১০ |
| আগুন | *ব্রতীন বসু* | ১০ |
| ব্রাহ্মণের ছড়া | *ভোলা ব্যানার্জি* | ১০ |
| নেড়ি | *তাপস বিশ্বাস* | ১১ |
| বিরহ | *সুব্রত ভট্টাচার্য* | ১১ |
| শেষের কবিতা | *সায়ন্তন মণ্ডল* | ১১ |


## শিশু ও ছাত্র-ছাত্রী বিভাগ


| | | |
|---|---|---|
| **My Pride, My Alma Mater** | ***Anirban Ghosh Hazra*** | ১২ |
| **Gaming World** | ***Raddur Samaddar*** | ১২ |
| **A Thought Channel.....** | ***Souravi Chatterjee*** | ১৩ |
| **Pahalgaon : Dream of the Great** | ***Mudra*** | ১৪ |

| | | |
|---|---|---|
| একজন সুখী মানুষের গল্প | *বর্ণব* | ১৪ |
| রথযাত্রা | *দীপমালা গঙ্গোপাধ্যায়* | ১৫ |
| টিউশন ক্লাস বনাম স্কুল | *সৌম্যশ্রী সেন* | ১৭ |
| একটি অসামপ্ত ভ্রমণ কাহিনী | *অর্কপ্রিয়া দাস* | ১৮ |
| হিজিবিজি | *মুদ্রা* | ১৯ |
| সময় | *রোদ্দুর* | ১৯ |


## প্রবন্ধ, গল্প ও অনান্য


| | | |
|---|---|---|
| **Children and Cancer** | ***Dr. Bani Deb*** | ২১ |
| **Marriage–an outdated, yet socially recognized institution** | ***Ananya Chakraborty*** | ২১ |
| **God Particle** | ***Subhendu Tosh*** | ২২ |
| **Postcard from Cuba** | ***Pathik Mitra*** | ২৫ |
| আহির | *দেবযানী ভট্টাচার্য* | ২৭ |
| একা | *পারমিতা* | ২৮ |
| শোধ | *দেবযানী ভট্টাচার্য* | ২৮ |
| ও পারেতে সর্বসুখ | *অধ্যাপক ডঃ মধুসূদন ভট্টাচার্য্য* | ৩০ |
| আমার দশভুজা | *কিন্নর রায়* | ৩৪ |
| একজন পুরুষের অভিব্যক্তি প্রকাশ | *অসিত মজুমদার* | ৩৯ |
| টাকী | *সুজিত সাধ্য* | ৪০ |
| রূপকথার রূপকুন্ড | *গৌতমাদিত্য ভট্টাচার্য্য* | ৪২ |
| ভারতের ঐতিহ্য : কিছু ভাবনা | *রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য* | ৪৭ |
| শততম মর্কট কাহিনী | *অনামী শর্মা* | ৪৮ |
| স্বাধীনতা সংগ্রাম থেকে শ্রেণী সংগ্রামে শতবর্ষে—'জীবন্ত কিংবদন্তী' কমরেড সমর মুখার্জী | *বিক্রমজিৎ ভট্টাচার্য* | ৬৩ |


## স্থায়ী বিভাগ


| | | |
|---|---|---|
| বিবেকানন্দ ধ্যানে-বিজ্ঞানে — 'সার্ধশর্তবর্ষে' | *জগন্নাথ রায়* | ৬৯ |
| মন কাঁদে (কবি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় স্মরণে) | *সুব্রত ভট্টাচার্য* | ৭১ |
| স্মরণীয়া | *ডাঃ তমাল দেব* | ৭২ |

**কবিতা**

## উর্দিতে থাকো

**পল্লব বরণ পাল**

ঘোষণা-শব্দে ঝিকোচ্ছে মেগাসিটি
সাজানো ঘটনা — নাটকের দরবেশ
খুন ধর্ষণ আইটির সেনসেক্স
শহরে গঞ্জে দানছত্রের মিটিং

চোখ সাদা আর স্বপ্নের রঙ নীল
তাই নীল সাদা মহানগরের উর্দি
ঘুমোও — তবেই স্বপ্নের মুখশুদ্ধি
নইলে ফ্রীগিফ্‌ট গালাগালি অশ্লীল

ঘুমোও — দেখবে শিল্পের কারুকাজ
ঘুমোও — দেখবে পরিবর্তিত শান্তি
ঘুমোও — পাহাড়ে আনন্দ অতলান্তিক
জঙ্গলে হিমশান্তি গন্ধরাজ

সাদা মনে থাকো অজন্তা চপ্পলে
দেবো সম্মান-ভাতা ও ইনাম প্রলেপ
নইলে আসল স্বরূপ করবো বার
নীল বিষ ঢেলে করে দেবো চুরমার

---

## পরিবারের ভালবাসা

**অনুশ্রী শর্মা**

চাঁদ যেমন ওঠে জোৎস্না রাতের আকাশে
মাগো তুমি তেমনই আলো
অন্ধকারে থাকা আমার হৃদয়
তার মাঝে প্রদীপ তুমি জ্বালো
মা আছেন আমার হৃদয়, বাবা আছেন মনে
তোমরা আছ আমার শরীরের ক্ষণে ক্ষণে
বাঁচতে চাই আমার হাত ধরে তোমার মুখে মুখে চাই
এই বলে কবিতা শেষ করে প্রণাম জানাই।

---

## ইচ্ছে

**কৃশাণু ভট্টাচার্য্য**

ইচ্ছে কী মোর রঙিন ঘুড়ি
যখন খুশি কবজা করি!
বৃষ্টি ফোঁটার মতন তাকে
যখন খুশি আঁকড়ে ধরি।

ইচ্ছে যে মোর রঙিন তারা,
দিবার মাঝে স্বপনধারা।
মন খেয়ালের, দিক বিদিকের
গভীর মনের ভাবনাধারা।

ইচ্ছে মোদের চলার সাথী,
মন আধারের ঝাড়বাতি;
আনন্দকে বরণ করার,
বরণডালার একটি বাতি।

আমার মনের ইচ্ছেগুলো
এমন যদি হত!
মন খারাপের ইচ্ছেটাকে
সরিয়ে ফেলা যেত।

আঁকড়ে ধরে আনন্দকে,
দুঃখের স্বপন যদি বা ঢোকে;
হাত সরিয়ে কায়দা করে,
দুঃখকে মোছা যেত।

জীবন তবে সুখের ছোঁয়ায়
হত যে রঙিন।
স্বল্প পরিসরের হলেও
স্বপ্নেতে বিলীন।।

ইচ্ছেটাকে এমন করে
পাল্টে ফেলা যায়?
ইচ্ছে হল মনের আধার
বৃষ্টি ফোঁটা নয়।

যতই ধরতে যাইগো তাকে
যতই বেঁধে রাখি;
ইচ্ছে তোমায় ধরা দিলেও
মনকে দেবে ফাঁকি।।

---

## ইউ.এস.এ. সিনড্রোম

**তাপস দাস**

হাত নিশপিশ করে
চোখে শকুনের হিংস্রতা।
উদ্ধত অস্ত্রে পাশের বাড়ির মাথাটা;
দেহ থেকে আলাদা।
ওই রাজহংসী; আহা একদিন পেলে
ব্রিজের নিচে গুষ্টি সমেত আদর।
ইউ.এস.এ. সিনড্রোম।

ওয়াশিংটন ডি সি কোকাকোলা
আই.পি.এল. বি.পি.এল. বিনোদন;
প্যালেস্তাইন পুরুলিয়া
দুধের বদলে শিশুর জন্য রক্তের বোতল।

'মানছি না মানবো না'—শুনবো না;
নোয়াম চমস্কি কথা বোলো না।
ইরাকের মতো বোমা ফেলবো;
লাদেন খুঁজবো দাসের বাঁধে।

খোলা বাজার চাই; বাণিজ্যে বসতি অস্ত্র।
প্যালেস্তানি রক্তে স্বাদ নেই
মহাকরণের উল্টো দিকে ঘাঁটি গাড়বো।

আলবৎ দখল নেবো একদিন
ভিক্টোরিয়া থেকে হিরাপুর;
চা বাগান ক্ষেত খামার সবুজ মাঠ;
আমার প্রভুর জন্য প্রাসাদ।
মুক্ত বাজার; নয়তো বোমা ফেলবো
ইউ.এস.এ. সিনড্রোম।

---

## একটা ঝাপসা আলো

**সূর্য শেখর চক্রবর্তী**

আজ থেকে এক লক্ষ বছর আগে
অন্ধকারে শুয়ে ছিল যে একটা লোক;
নিরক্ষর, সে অজ্ঞাত বিজ্ঞানে—
খুঁজছিল এক নতুন দিনের আলো।

শীতের রাত্রে হাতে নিয়ে কিছু পাথর,
গাইছিল সে যে কতই রকম গান—
যে গানের নাইকো কোন ভাষা,
জড়িত কণ্ঠে চলছিল তা অবিরাম।

হাতের পাথর চমকে উঠল হঠাৎ!
একটা ঝাপসা আলোর দেখা দিল;
গানটি যে তার থামল তৎক্ষনাত—
উত্তেজনায় হাত পা তার কাঁপছিল।

আগুন! এ যে আগুন দেখা দিল!
বিস্মিত হয়ে ভাবল লোকটি মনে।
আনমনে হাতে পাথর ঘষতে ঘষতে
একটা ঝাপসা আলো দেখা দিল বনে।

সেই দিন থেকে লক্ষ বছর বাদে
জ্ঞান বিজ্ঞান জীবনের প্রতিপদে।
আমরা জানি কত বিজ্ঞানির নাম—
আইন্সটাইন, নিউটন, মাইকেল ফারাদে।

বিজ্ঞানের জগতে আজি আলো, কেবল আলো!
বজ্রও বিজ্ঞানের ভৃত্য হল।
শুধু বিজ্ঞান জানে না,—সেই লোকটির নাম
যে খুঁজেছিল এক নতুন দিনের আলো,
দেখেছিল সেই একটা ঝাপসা আলো।।

---

## দৃশ্যনাট্য

**স্বপন দত্ত**

দুপুরে মানে ছিল না দৃশ্যের—
গাছের ওপর পাটকিলে আস্তর
আমের মুকুলে শুধুই সবুজের আভা

সূর্য হেলতেই—
ছায়া ক্রমে দীর্ঘ
গাছে সবুজের মোহ
মুকুলের সবুজ যেন অহংকারী

খুঁটে নিয়ে সারাদিন
পাখি ফিরছে বাসায়
দুপুরভর তেতে-ওঠা কালো রাস্তা
ক্রমেই সচল
দু'পাশের দোকান ভাঙছে আড়মোড়া
ঝাঁপ খোলার শব্দে...

একা এবং একা...

---

## হে আমার প্রাজ্ঞ সময়

**তাপস দাস**

পিছমোড়া করে বেঁধেছো
অবাধ্য রাতে; বন জোছনায়।
প্রথম লেখা বর্ণমালায়; লিখিয়েছ স্বীকারনামা—
''আমার বাবা আর পার্টি করবে না''

পৃথিবীতে শোকের আয়ু বড় কম,
শীত গ্রীষ্ম বর্ষা বসন্ত চলতে থাকে
তবু সব শোক কি মরে যায়?
মায়ের দিশাহীন সীমন্ত;
ন্যাড়া মাঠের মতো পড়ে থাকা আবেগ?

আমিও তো বড় হচ্ছি
বদলে যাচ্ছে মুখের রেখা।
অস্তিনে রেখে দিচ্ছি না মরা শোক;
আর সেই স্বীকারনামা।

হে আমার প্রাজ্ঞ সময়
তোমার তো আবর্তন পরিক্রমণ আছে।
তোমাকেও অবাধ্য রাতে;
বন জোছনায় পিছমোড়া করে বাঁধা হবে;
বলো না সেদিন—''ক্ষমা পরম ধর্ম''।

---

## নারী

**শুভ্রা পাল**

ধূসর জীবনের রুদ্ধ আঙিনাতে
বেপরোয়া শ্রাবণ এলো চুপিসারে,
ডাঁয়ে বাঁয়ে বধির কালো রাত
অপ্রত্যাশিত ব্যথার সারি
জলদগম্ভীর মেঘের মাঝে
একলা দাঁড়িয়ে—
কিংকর্তব্য বিমূঢ় এক নারী।

ভাষাহীন আদ্র দুই চোখ
কম্পমান কীটদংশ শরীর
সভ্য সমাজের চোখে হলো ভ্রষ্টা
তবু হে নারী—
তুমি, শুধু তুমি—
এ অসীম জগতের স্রষ্টা।

এই শস্য শ্যামল বসুন্ধরার শক্তিরূপিনী—
সৃষ্টি স্থিতি লয়ের
শুভঙ্করী জননী সুভাষিনী,
কৃষ্টির আনন্দঢালা সুখী গৃহকোণের
সদা জাগ্রত পূজারিণী,
সুশীল সমাজে তুমি কন্যা জায়া
সৌভাগ্যদায়িনী
তবু 'বর্বরের' পৈশাচিক ক্ষুধায়
সদা সর্বদা তুমি 'একা' হও কলঙ্কিনী।
হায়রে সভ্যতা.....

---

## এক টুকরো গদ্য

**অনিন্দিতা ভৌমিক**

কাল রাতে এক বৃষ্টি ফোঁটার হাত ধরে
খুঁজতে গেলাম আমার কৈশোর।
যা কোনো রাজকন্যার নয়।
নিতান্তই সাদামাটা এক কিশোরীর।
হঠাৎ দেখা এক কিশোরের সাথে,
বড় মায়া মাখা সেই মুখ,
গভীর স্বপ্নিল তার চোখ।
মনে হলো বহুকালের চেনা।
বললাম, ''নবীন কিশোর, চেনো আমায়?''
সে শুনতেই পেল না।
স্বপ্নগুলো ছড়িয়ে ফেলে,
গেল চলে কোনো এক রাজকন্যার খোঁজে।
আমি কুড়িয়ে নিলাম ছড়ানো স্বপ্নগুলো।
দেখি তাতে, এক চাঁদ জ্যোৎস্না,
এক রাশ সদ্য ফোটা জুঁই,
থইথই এক নদী,
ভিজে মাটির সোঁদা গন্ধ।
এক মুঠো খুশি আর.....
কয়েক বিন্দু চোখের জল।
স্বপ্ন গেঁথে কি কবিতা তৈরি হয়?

---

## ভিজে গেছে.....

**দীপ্তপ্রকাশ চক্রবর্তী**

হাওয়ার সঙ্গে একা
একা
পুরুষ, তবু পুরুষ নয়
নারী, অথচ নারী নয়
ছায়াজন্ম
সর্বনাশের নেশায়
কালচৈত্র
নাচে জন্ম নাচে মৃত্যু
আকাশখানা কাঁপে
হাওয়ার সঙ্গে একা
একা
পুরুষ, তবু পুরুষ নয়
নারী, অথচ নারী নয়
নৌকার গায়ে-আঁকা চোখ
জন্ম আর আষাঢ়ের সঙ্গে
আমাকেও সঙ্গে নিয়ে ভিজেছে
আলুলায়িত কেশ
হাওয়ারা চারিপাশ.....

## সুন্দর হে

**দীপ্তপ্রকাশ চক্রবর্তী**

নরসুন্দরের হাতে ছিল নদী
আমার ছিল কথা.....

মাটির নিচে মিলিয়ে-যাওয়া জল
একদিন নারায়ণপল্লীর সীমানা ছুঁয়ে
বুকের কাছে উঠে এল;
একদা অসম্পূর্ণ কাহিনী
সিঁথির ভিতর বহমান.....

ঘাড়ের কাছে তন্ময় জ্যোৎস্নায়
পা ডুবিয়ে কথক ও কয়েকটি বোকাচরিত্র
জুলফি বেয়ে নেমে-আসা অপার শিহরনে
টের পেয়েছিল নক্ষত্র প্রতিম বিষাদ

প্রতিমা আর প্রবাহ ছুঁয়ে
আসা-যাওয়ার অতীত বালিয়াড়ি অভিমুখে.....

## নিরুত্তর ছবি

**দীপ্তপ্রকাশ চক্রবর্তী**

নয়নে নয়ন স্পর্শ করা মাত্র মৃত্যু অনিবার্য
গদ্যে ও কবিতায়
এ জীবন নক্ষত্রের .....

জল ও সর্বনাম
বাবা ও এস্রাজ
মাঝরাতে ঘুম ভেঙে
ছেড়ে যায় পুরীর সৈকত
নিরুত্তর, নয়নে নয়ন.....

রোশনি, বেদ ও অন্ন
মধ্যম পুরুষের অস্থি মজ্জা সুষুম্না
জলের আরও কাছে
শঙ্খের অতলে
বনান্তের দিকে মুখ

দরজা খোলা
নয়নে এস্রাজে
স্পর্শ অনিবার্য

## আঁধারমণি

**দীপ্তপ্রকাশ চক্রবর্তী**

ধারাস্নান মায়াবী লিখন কেমন আছিস
পঙ্‌ক্তিসীমা পার হলে দুধফেনা
মাঠের পর মাঠ মধ্যযুগের ঘোড়সওয়ার
আঁধার আমার ভালো লাগে

কেন এত আলো আকাশেতে? ভাঙাচোরা বুকের সিন্দুকে
আলোর আলো আঁধার সুষমায়, অশ্রু নেমে আসে.....
ঘরদুয়ার বাসনাকুসুম কালরূপী বৃক্ষতলে
শ্রাবণধারায় জন্ম ও মৃত্যুবীজ কতবার

ভালোবেসেছে এ জীবন এ আঁধার.....
কাহিনী উপকাহিনীতে বুনে চলা প্রেতপ্রশ্ন ঢোলকে-মাদলে
মাঠের পর মাঠ কায়াহীন অশ্বের চাহনিতে তোলপাড়
কেমন আছিস আঁধার লিখন, লুপ্ত চারিধার.....

# স্মৃতি

**সিদ্ধার্থ দত্ত**

আমি তো পারি না আমার আবেগ
দমাতে দুহাতে চেপে
তাই তো আমার বেহিসেবি মন
দুর্বার পথে ছোটে;

দুর্বার পথে ছুটে ফিরে আসে
আমার অবুঝ মন
উদাসী হাওয়ায় ভেসে চলে যায়
বিষাদের দিন-ক্ষণ;

বিষাদ বায়ুর শিকার হয়ে
ঘুরে মরি পথে-পথে
সজল চোখের ঝাপসা আলোয়
শূন্যতা ঘিরে থাকে;

দীন হীন গ্লানি নিত্যসঙ্গী
আমার যাপন পথে
তারই মাঝে কিছু ক্ষণ রয়ে যায়
উজ্জ্বল প্রতিভাসে।

পারি না আমি তো উজল স্মৃতিকে
হাত দিয়ে মুছে দিতে
তাই আমি যাই পরাজিত হয়ে
বার বার তার কাছে;

সেই তো আমার রিক্ত হৃদয়
ভরে দেয় সংলাপে
আমাকে সদাই প্রেরণা জোগায়
বুক বাঁধি ভরসাতে;

তার কাছ থেকে নিতে পারি শুধু
দিতে আর পারি কই?
তাই তো আমার সে নেয়ায় থাকে
দ্বিধা-সংশয় দুই;

দ্বিধা-সংশয় গ্লানি পরাজয়
বেদনা বিধুর পথে
আমি তাকে দেখি নিভৃতে দাঁড়িয়ে
আশ্বাস ভরা হাতে।

---

# ইন্দ্রজাল

**দীপঙ্কর নারায়ণ ঘোষ**

অনেক স্বপ্ন শেষ।
বুনেছি অনেক ইন্দ্রজাল
স্মৃতির সৈকতে পদচিহ্ন খুঁজে।
অনেক আশ্চর্য সাধ, প্রগল্‌ভ কল্পনা
মনের আকাশ হতে খসে পড়া তারার মতন
ঝরে গেছে দূরের তিমিরে।
জোনাকির আলোর মতন
অপরূপ কত ক্ষণ তৃষা
নীলার ফুলকি এঁকে রাতের শরীরে
ছাই হয়ে গেছে।
আদরে চয়ন করা
সোনালী পরাগ ভরা
ফোটা, আধ-ফোটা কত আশার মুকুল
স্বপ্নের আঁচল ছিঁড়ে
খোয়া গেছে কে জানে কোথায়।
রোমাঞ্চিত কত নেশা
ঘুমে—জাগরণে মেশা
কবোষ্ণ কোমল সুখ, নিটোল আবেশ
ঘুমের দিগন্তে হলো শেষ।
পাওয়া আর হারানোর
তবু হাত বাড়ানোর
ভুল আশা-নিরাশার কাঁটার দহন।
বেঁধেছি এ খেলাঘর হে হৃদয় তুমি আর আমি
দুর্লভ ভুলের ফুলে জীবনের দিয়েছি প্রণামী।
কেন যে বেসেছি ভালো এ আশা বঞ্চনা
এই মুগ্ধ আলো-ছায়া
এই দৃশ্য এই মায়া
অস্থাবর সত্য মিথ্যা
ফাঁকির জঞ্জাল।
সাধ হয়
করি গিয়ে রৌদ্রস্নান।।

---

## চুপকথা

### ডা. নির্মাল্য রায়

কথার বুকে জমছে কথা
আকাশপানে জমছে মেঘ
বৃষ্টি পড়ুক টাপুর টুপুর
কথায় - মেঘে দারুন প্রেম

তোমার মনের চুপকথারা
মারছে উঁকি জানলা দিয়ে
বৃষ্টি হয়ে পড়ুক ঝরে
বর্ণচোরা কথার মেয়ে

মেঘবালিকা মুচকি হাসে
আকাশ পথে নৌকো হাওয়া
মনমাঝি তার হাল ধরেছে
সব হারিয়ে তবুও পাওয়া

কথাগুলো সব ছিল যে সাদা
মেঘের মতো পেঁজা তুলো
জমতে জমতে কালো কথা
মেঘ থেকে যে বৃষ্টি হলো

বৃষ্টিভেজা ওই মেয়েটা
হঠাৎ কোথায় হারিয়ে গেল
তোমার মনের চুপকথারা
এবার বোধহয় মুক্তি পেলে।

## আগুন

### ব্রতীন বসু

আমার গোপনীয়তার দিঘিকে আলাদা করে রেখেছি—
সম্পর্কের চেনা জমির থেকে আলাদা করে সযত্নে
আলাদা করে,
বহু বছর ধরে রেখেছি।
চেনা জমিতে আবেগ আসে চেনা মেঘ-বৃষ্টির হাত ধরে।
তবুও কখনো, কোনো এক রাতে কবিতায়, গানে বন্যা হয়,
দিঘির জল মেশে গিয়ে জমিতে,
তখন তুমি যেন চক্‌মকি পাথর—
এত জল পুড়ে যায় আগুনে,
এতটা আমি, ততটা তুমি—সব পুড়ে যাই আগুনে,
শ্মশান থেকে চুরি করা সে সব রাত আসে মাঝে মাঝে।।

## ব্রাহ্মণের ছড়া

### ভোলা ব্যানার্জি

এই জীবনের সরু পথে,
চলিতে চলিতে কত বাঁধা।
পরিশেষে, জীবনের কোন রথে।

চলেছো কার স্বার্থে।
জন্ম হোক দরিদ্র অনাহার স্বার্থে।
দিন কাটে।
শিশু হতে, কৈশোর যৌবনে দিল, পা!
বিয়ে দেবার মতো, তাগিদে।
যোগ্য বর মেলা বড় দায়
ব্রাহ্মণ পিতা, অসহায়, কন্যা দায়।
সম্বন্ধ-আশি জুড়ি বয়স তিন কুড়ি।
মাতার কণ্ঠ ঢল বিয়ে দেবার তরি।
মুদে আঁখি কন্যা অসহায়!
আকাশ পানে চায়—নিরুপায়।
যদি পাড়ো, বলি করো।
ব্রাহ্মণের সুতো, নিজের গলে পড়ো।
ডুপ দিয়ে মরো।
এই ব্রাহ্মণের সমাজ, নিয়মে বাঁধা।
স্বর্গ লাভের আশায় চলেছ,
ব্রাহ্মণের ছায়ায়।
নয় দণ্ড সুতোর মায়া-মরিলে জীবন হয় কায়া।
ব্রাহ্মণের যত মন্ত্র সংস্কৃত
আর কিছু পুঁথি - পৃষ্ঠা
আর এক নিষ্ঠা।

## নেড়ি

**তাপস বিশ্বাস**

লেজ নাড়ি, শুঁকে শুঁকে
আপন আপন খেলা
শুঁকে শুঁকে প্রভুপাদের পদচুম্বন
প্রভুপাদ মাথায় হাত বোলান
লেজ ধরে নাড়েন ঘাটেন...
শুঁকে শুঁকে উষ্ণ কোলখুঁজি
বুঝি এইবার কৃপা করবেন
শরীরের সব খাঁজে
কাজে অকাজে নড়াচড়া চলে
তলে তলে শেকড় পেয়েছে খোঁজ গোপন জলের
নেড়ি জল ভালো চেনে, তল ভালো বোঝে...

---

## বিরহ

**সুব্রত ভট্টাচার্য**

জানালা দিয়ে বেয়ে নামা
বৃষ্টির একফোঁটা জল
হঠাৎ দেখি গাল বেয়ে নামে
জলে ভেজা মনের সোঁদা গন্ধ
আর মাঝে মাঝে দীর্ঘশ্বাস—
বিষণ্ণ দুপুরের স্তব্ধতা আর
অবিরাম বর্ষণ—

আমায় মৌন করে
অস্থির চিত্ত ভাবায়
কেন হলাম না
নীল আকাশ, পাখি, নীল সাগর?

ভাবায় আর ভাবায়—
বর্ষণ থামে
তার জল এসে ঠোঁটে লাগে
নোনতা তার স্বাদ।।

---

## শেষের কবিতা

**সায়ন্তন মণ্ডল**

চিন্তার মরুভূমির বিস্তীর্ণ বালুকারাশির মধ্যে
আমি এক ভ্রাম্যমাণ পথিক—
ক্লান্ত, শ্রান্ত, তৃষ্ণার্ত
একটু জল চাই—
কিন্তু মরিচীকা ছাড়া আর কোথাও জলের দেখা পাই না
খুঁজে চলেছি ওয়েসিস—
কিন্তু অদৃষ্ট দু হাত দিয়ে তাকে আমার দৃষ্টি থেকে
আড়াল করে রেখেছে।
জানিনা, এই উষর প্রান্তরেরই কোথাও
আমার সমাধি খনন করা আছে কিনা'
চেষ্টা করে চলেছি সেই জায়গাটা এড়িয়ে যাবার,
কিংবা হয়ত অজান্তেই তার দিকে এগিয়ে চলেছি—
একটু একটু করে ...

---

অম্লুশা বসু
ষষ্ঠ শ্রেণি

**শিশু ও ছাত্র-ছাত্রী বিভাগ**

# MY PRIDE, MY ALMA MATER

**Anirban Ghosh Hazra**

I really find it queer to write about my 'Maa Vidyapith' which is unlike mere writing about 'my school'. Reaching the fag end of my glorious Vidyapith days, a mélange of indelible events & thoughts adorns me which I find hard to chronologise. Rather I take it as a great opportunity to reside on her loving & caring lap & be intensely associated with her ideology for long eight years. Every golden day in Vidyapith commenced with amazing sunrise; perfect ambience round the campus followed by chirping of birds in the dew drenched trees & declined with littered sky above. Moreover, the outstretched verdant beauty of the campus & the beautiful sculptured buildings attracted me ever since I got admission here Vidyapith has taught us to cultivate self respect, generosity & magnanimity of mind . I learnt from her how to reap a good harvest out of earnest sincerity in varied aspects in order to make our lives enriched with good & humble humanity. My Vidyapith helped us to come in close touch with the sense of togetherness through the day long activities connected with the Vidyapith routine. More I advance towards the end , more deeply I find in myself a sense of introspection even about the commonest features of my Vidyapith that surround me. Vidyapith — I found a way, in order to build life's edifice on an adamantine foundation. Vidyapith, to me, 'a home away from home' has gradually turned into 'alma mater' & I feel proud & inexplicable joy to uphold the lofty ideals of my 'alma mater'. 3rd August '03 was the very first day in Vidyapith when I cried. Tears will surely tinge my eyes on the concluding day in Vidyapith as well. But they speak differently "you have to stay alone in Vidyapith "& "Vidyapith is forever with you" …….brimming with joy.

# Gaming World

**Raddur Samaddar**

A world of duties
And spare beauties!
Where it comes to the life,–
The weapons are guns and knife.
There you need to struggle…
And your skills need to juggle;
Search your livelihood on your own
If you give up, then you are gone–
It is the life where you are not you
And so you need not think of your view!
Cool and clam and style you show,
Play with your own luck if;
You want a bow,
At last of life, it is of no use–
Do you know it is a form of children abuse?

**Amrushaa Basu**
Class - VI

# A Thought Channel.....

**Souravi Chatterjee**

I believe in the free space
Where the balloons can play well
I believe in the naked truth
Where the emotions can reflect with its genuine look
I believe in the natural self
Where artificiality is rooted out from its base
I believe in the day dream
Where the immaturity can have a beginning
I believe in the undisrupted humanity
Beacause it can bring the tears in front of a sensitive transparency
I believe in the stupidity
Which comes from the heart faithfully
I believe in the mother's smile
Which only wishes for her child's successful life
I believe in the mentor's scolding
As it says about their blessings and expectations which are genuine
I believe in the regional identity
Where the concept of "Unity in Diversity" lies with a dignity
I believe in the candle light
Which give us the ray of hope in the dark nights
I believe in the flaring wisdom
Which help us to ignite our matured decisions
I believe in the nurtured insanity
With an expectation that somebody will understand its vitality
I believe in the sanctity of a child's fun
As they run in the field with the flying dust
I believe in the rudimentary smell
Where the flavour is so real
I believe in the glowing horizon
Which engulfs our busy foolishness
I believe in the full grown rice and wheat
As the Indian soil has given birth to it
I believe walking barefoot in the roof
As the sky seems to submit in me its youth
I believe in the full moon night
As its shimmering rays distributes itself over my restless mind
I believe in the glittering stars
When I try to remember about yesterdays counting of my green grass

**I believe to remain silent sometimes**
**To write about some unspoken words for the page of my life.....**

---

# Pahalgaon : Dream of the Great

**Mudra**

After the tiring journey of the day, when we reached the village of the pony owners, it was completely dark. During the conclusive part of our journey, I had discovered the major beauty element of the place. While looking outside through the window I could roughly see some cars passing by. But after sometime it all became silent. I looked at it and it seemed as if the road was shining. Suddenly I found that it was the Lidder river and truly later I found it was the major beauty element. It was nearly ten o'clock when the bus stood out of the narrow path to our hotel. The weather was extremely cold outside. When we were standing on the road, I could feel that the place was extraordinary. I felt like appreciating the beauty instantly but it was completely dark. The experience of the night was unique. There was continuous sound of flowing water and I felt too excited to see the river. The next morning when I woke up, outside through the window I could see the most beautiful scene I had ever seen. The river was flowing with all its grace. The hills behind contrasted greatly with the beautiful flowers and the graceful river. The sun later brightly shone on the mountains around. It looked really like a paradise. And I gained the realization why Pahalgaon or Kashmir is 'Paradise on Earth'. This was my great experience in Pahalgaon– Dream of the Great.

# একজন সুখী মানুষের গল্প

**বর্ণব**

এক জেলে দুপুর পর্যন্ত মাছ শিকার করে সারা দিনের প্রয়োজন মিটিয়ে ফেলল। অতএব সে এবার মাছ শিকারে ক্ষান্ত দিয়ে গাছের নিচে বিশ্রাম নিতে লাগল। একটু পর সে খুশির আতিশয্যে বাঁশিও বাঁজাতে শুরু করল। পথের পাশ দিয়ে একজন ধনী ব্যবসায়ী গাড়ি নিয়ে যাচ্ছিল। জেলেকে দেখে সে গাড়ি থামিয়ে রাগান্বিত স্বরে জিজ্ঞেস করল—''মাছ শিকার ছেড়ে তুমি এভাবে অলস ভাবে বসে আছো কেন?'' জেলে উত্তর দেয়—''আজকের দিনের প্রয়োজনীয় মাছ আমার শিকার হয়ে গেছে।'' ধনী ব্যবসায়ী আরও রেগে গিয়ে বলে—''তুমি আরও বেশি মাছ কেন শিকার করছ না?'' জেলে বলে—''বেশি মাছ দিয়ে আমি কী করব?'' ব্যবসায়ী অবাক হয়ে বলে—''বেশি মাছ ধরে তুমি তা বিক্রি করে বেশি অর্থ উপার্জন করতে পারবে। তা দিয়ে তুমি আরও বড় নৌকা কিনতে পারবে''। জেলেও অবাক হয়ে বলে—''তারপর আমি কী করব?'' ব্যবসায়ী বলতে থাকে—''বড় নৌকা দিয়ে তুমি আরও বেশি মাছ ধরতে পারবে—আরও বেশি অর্থ পাবে আর তা দিয়ে অনেকগুলি নৌকা তুমি ক্রমান্বয়ে কিনতে পারবে''। জেলে বলে—''এরপর আমি কী করব?'' ব্যবসায়ী বলে—''তুমি অনেক কর্মচারী নিয়োগ করবে। এবং তোমার ব্যবসা বাড়তে থাকবে। একসময় তুমি আমার মতো বড় ব্যবসায়ী হয়ে যাবে।'' জেলে বলে—''বড় ব্যবসায়ী হয়ে আমি কি করব?'' ব্যবসায়ী বলে—''তুমি তখন আরাম করে বিশ্রাম নিতে পারবে—একজন সুখী মানুষ হতে পারবে।'' জেলে বলে—''আপনি কি কখনো আরাম করে বিশ্রাম নিতে পেরেছেন?'' ব্যবসায়ী ভবিষ্য? কোন এক স্বপ্নে বিভোর হয়ে উত্তর দেয়—''না, আরামের এখনো অনেক দেরি—আমি আমার ব্যবসাকে আরও বড় করতে চাচ্ছি''। জেলে হেসে দিয়ে বলে—''আপনার বয়স ষাটের উপর চলে গিয়েছে। অথচ এখনো আপনি আরাম করতে পারেননি। কিন্তু আমাকে দেখেন—আমার বয়স আপনারই মত—কিন্তু আমি আমার চাহিদাকে সীমিত রেখেছি বলে সবসময় এভাবে আরাম করি আর বাঁশি বাঁজাই। আপনি ভবিষ্যতে সুখী হবেন বলে এখনো ছুটছেন আর আমি নিজেকে অনেক আগে থেকেই সুখী করে রেখেছি। অতিরিক্ত সম্পদের মাঝে সুখ খুঁজা আর মরুভূমির মাঝে মরীচিকার পিছনে ছুটা একই কথা। অল্পতে যে তুষ্ট থাকতে পারে—সেই মূলত সুখী হয়''। ধনী ব্যবসায়ী গম্ভীর মুখে গাড়ি ঘুরিয়ে চলে গেল। জেলের কথাগুলি এতই সত্য যে—এর জবাব তার কাছে নেই।

# রথযাত্রা

দীপমালা গঙ্গোপাধ্যায়

স্টেশনের সামনে যে কোয়ার্টার্সগুলো হয় সেখানে আমরা থাকতাম। থাকার কথা ছিল স্টেশন থেকে অনেক দূরে অনেক বড় বড় বাংলোগুলোর একটায়, কিন্তু বাবার কাজের ধারা এমন ছিল যে রাতবিরেতে ট্রেন ধরতে হলে ওইরকম বাংলোসুলভ গাম্ভীর্যে কাজ হত না। তার থেকে ট্রেন স্টেশনে ঢুকলে বাড়ি থেকে গার্ডসাহেব একটু দাঁড়ান, আসছি বলেই দিব্যি বেরনো যেত। তাছাড়া স্কুল, বাজার, লোকজন, প্রাণখোলা হাসি সবকিছুর জন্যই টী/৪৭, স্টেশন কলোনি, রাঙাপাড়া নর্থ এই ঠিকানাটাই আমাদের স্যুট করত। তবে কি আঙুর ফল টক্? এক্কেবারে না, অফিসার্স কলোনির মিসিবাবাদের দেখলে বুঝতে পারতাম ওরা কেমন যেন নিজেদের এঁকে নেওয়া একটা গণ্ডির মধ্যে থাকত কিন্তু কেন যে থাকত নিজেরাই জানে না। সে বড় আজব কুদরতী! সে যাই হোক আমাদের ওই পাঁচটা কোয়ার্টার্সেই অন্তত একজন করে চাচা থাকত যাদের মূল পরিচয় ছিল মালবাহক, যাকে আমি আপনি আদর করে বলি কুলি। আমাদের বাড়িতে থাকত মহেন্দ্র আর জগন্নাথ চাচা, ঝরনা দিদিমণির বাড়িতে থাকত ভাগবত চাচা, যে কিনা একবার এসে দিদিমণিকে বলেছিল: মাঈজী, আজ 'মণিহার' আনলোড করে আসলাম! সে খবর পেয়ে আমরা চমকিত, পুলকিত, আশ্চর্যান্বিত জাতীয় অনেক কিছু হয়ে নিজেরাই সরেজমিনে তদন্তের জন্য গুডস্ অফিসে গিয়ে জানলাম সেটি মণিহার নয়, 'ম্যানিওর'! এ হেন ভাগবত চাচার সুযোগ্য ছিল রামেশ্বর বা মতান্তরে রামাশ্রয়। বেশ 'হাস্যমুখ' ছিল, তাকে নিয়ে কস্মিনকালে কোনো সমিস্যে আছে বলে জানিনি। তার ষোলো বা আঠারো কী যেন একটা বয়সে দেশে নিয়ে বাবা বিয়েও দিয়ে নিয়ে এল। হঠাৎ একদিন 'উই ভগবানোয়া! মোর কা ভইল বা!' যোগে চাচার প্রচুর কান্নাকাটিতে জানলাম সেই রামাশ্রয় বাপের আশ্রয় ছেড়ে নিরুদ্দেশ! আমরা মর্মাহত হয়েও কালের নিয়মে ভুলেও গেলাম ওর কথা। ভাগবত চাচারও যে খুব মনে পড়ত এমন প্রমাণও পাইনি।

আমাদের স্কুলে যেতে রেলের বুকিং অফিসটার পেছনে একটা টিয়াপাখিওয়ালা বসত ভবিষ্যদ্বাণী করার জন্য। কী সব যেন লেখা কার্ড থাকত ওর সামনে। বেশ ভিড় সবসময় ওকে ঘিরেই থাকত। এই জনপ্রিয়তা ওর মাথার পেছনে এমন একটা জ্যোতির্বলয় তৈরি করেছিল যে আমাদের বেশি পাত্তা দিত না। এটাতে আমাদের বেশ ক্ষোভ ছিল। এত বড় গোঁফওয়ালা ডান্ডা হাতে পান্ডেজি আমাদের সমঝে চলত কারণ স্টেশনের হত্তা-কত্তা-বিধাতা, স্টেশন-মাস্টার জেঠু আমাদের সাথে বেশ হাত কচলে কথা বলতেন। নইলে তাঁর দিবানিদ্রা উড়ে যাওয়ার মস্ত আশঙ্কা ছিল। আমরা বিশেষ কিছুই করতাম না। দুপুরবেলাকার ১৭৫ আপ আর ১৭৬ ডাউনের ট্রেনটা চলে যাওয়ার পর যখন মোটামুটি ঘণ্টা বারোর জন্য নিশ্চিন্ত তখন যার জীবনে যা কিছু খেলার বাসনা সব মিটিয়ে নেওয়ার (পৈশাচিক উল্লাস সহযোগে) ইচ্ছে পূরণ করতাম জেঠুর ঘরের সামনে। ভাবতেই পারেন এ আর এমন কী, ক'টি কচিকাচার কলকাকলি! মায়া হয় জানেন আপনার জন্য, মায়া হয়! তার সাথে ছিল একবার ওর একবার তার জলতেষ্টা মেটাবার পালা। আর জলের ব্যবস্থাটা ছিল তাঁরই ঘরে। না না সারা বছর এমন মায়ে খেদানো বাপে তাড়ানো কাণ্ড করতাম না। শুধু যখন যখন বুকিং অফিসে বিরাট বিরাট টেবিলগুলোর ওপর ওঠার চেষ্টা করতে দেখে উনি বাবাদের বলে দেবেন বলে শাসাতেন তখন। সে যাই হোক ফিরে আসি টিয়াপাখিওয়ালার কথায়। আমাদের প্রবল ইচ্ছে একদিন ওর কাছে ভাগ্য গুনিয়ে নিই। কারণ বাপি আর রাজস্থান হোটেলের মালিকের ছেলে রাজেশ একদিন ওর কাছে গিয়েছিল, ও নাকি অনেক কিছু বলেছে ওদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে। অবশ্য কী বলেছে সেটা কিছুতেই বলল না ওরা। এখন বুঝি নিজেদের সম্বন্ধে বলার মতো অতটা কল্পনা শক্তি ওদের তখনো হয়নি। আমরা মরিয়া হয়ে যে যার ভাঁড় থেকে দশটা করে পয়সা নিয়ে ওর সামনে একদিন ঘুরঘুর করতে লাগলাম। সরস্বতীদির হাতে ধরা পড়ে উদ্দেশ্য কবুল করাতে সে আর কোন কথা না বাড়িয়ে পণ্ডিতজীর দোকানে নিয়ে বাদাম কিনিয়ে দিল। তখনও গুরুজনের মুখের ওপর কথা বলার রেওয়াজটা চালু হয়নি। ফেলো কড়ি, মাখো তেলের আইডিয়াটা যখন বেকার হলো তখন আমরা অন্য পথের সাহায্য নিলাম। আমরা টিয়াচাচার ঠিক মাথার ওপর বুকিং অফিসের ছোট্ট বাগানের যে রেলিং ছিল সেই রেলিং-এ গিয়ে বসলাম। কিছুক্ষণ পরে রেল পুলিসের ও.সি কাকু চার-পাঁচ জনের একটা ফোর্স নিয়ে যাওয়ার সময় কট্‌মট্ করে তাকালেন। আমরা ভালোমানুষের ছেলেমেয়েরা কিচ্ছুটি না বোঝার ভান করে পরের দিন থানার শনিপুজোর লুটে চিনির না এনে গুড়ের বাতাসার ফরমাস করলাম। ভরা রাস্তায় ও.সি.র সাথে ওই জাতীয় আনঅফিসিয়াল কথাতে উনি আর আমাদের ঘাঁটালেন না।

তারপর ভিড়টা একটু খালি হতে গাছ থেকে পাকা ফলটির মতো টুপটুপ করে রেলিং থেকে ঝরে পড়লাম। সবে তাকে ঘিরে আমরা ক'জন বসতে যাব হঠাৎ দেখি পিছন দিকে গুটিকয়েক ছায়া। ঘাড় ঘোরালাম। আমার বাবা!!! টিয়াচাচার মুখের সেই দুঃস্বপ্নের মতো হাসি আজো ভুলিনি। শুধু চোখের ইশারায় আমাদের অমন কাবু করা যায় এ তো কস্মিনকালেও ভাবেনি। আপনাদের টেনশন হচ্ছে তো এইসব ছেলেমানুষগুলোর নির্দোষ ফুর্তিতে কে এমন জল ঢালল! খুব জানতে ইচ্ছে করছে! আমাদেরও করেছিল। বিশেষ কিছু করতাম না। সেই মুহূর্তে হাতের সামনে পেলে 'কাচ্চা চাবা যাতা!' বিধি বাম! ববি-গোপিরা স্বপনকুমার আর আমি কালনাগিনী সিরিজের সব কটা বই নতুন করে গুলে খেয়েও যখন বের করতে পারলাম না সেই সময় একবার ও.সি.কাকুর সঙ্গে দেখা হওয়ার পর একটু হেসে বললেন, 'এরপর টিয়াওয়ালাটার কাছে যখন যাবি বাতাসা নিয়ে যাস, তোদের পয়সা লাগবে না'। অমনি পুরো ব্যাপারটা সাফ হয়ে চক্ষুতে ধরা দিল। বুঝলাম সেদিন রোদে বেরনোর আগে ও.সি. কাকুই বাবাদের ওই খবরটি দিয়ে গিয়েছিলেন। বিশ্বাসঘাতকতার এর থেকে বড় উদাহরণ ওই বয়সে আর চোখে পড়েনি।

এই ভাবেই যাচ্ছিল দিন। একদিন সেই টিয়াওয়ালাটার পাশে দেখি একটা কালো জোব্বা, মাথায় কালো ফেট্টি, গলায় বেশ কটা রুদ্রাক্ষের মালা, কানে মাকড়ি, কপালে লম্বা করে টানা লাল টকটকে সিঁদুরের টিপ, থুতনিতে কিছুটা দাড়ি আর ভাঁটার মতো জ্বলা লালচে দুচোখ নিয়ে কে যেন জড়িবুটি বিক্কিরি করতে বসেছে। দেখে তো আমাদের পিলে চম্‌কে প্রাণ ব্যোম্‌কে এক্কেবারে খোক্কাসের কলতানি! এখানেই শেষ নয়, টিয়াওয়ালাকে ইশারায় জিগেস করতে গিয়েছিলাম তো সে বাবাজীর চোখে চোখ পড়তে মাঘমাসের মুলোর সাইজের ছ্যাৎলা পড়া দাঁত বের করে 'আরে মুন্নি ক্যা ভইলবা'! বলাতে সবাই মিলে পগার পার। এবারে বুকিং অফিসের সামনের দরজা দিয়ে সোজা ঢুকে গেলাম সমরেন্দ্রদার কাছে, দাদার বন্ধুর দাদা হওয়াতে যার কাছে ছিল আমার অগাধ প্রশ্রয়, বাবাজীর ব্যাপারে ইন্‌ফরমেশন গ্যাদার্‌ করতে। জীবনে প্রথম স্টেশন কলোনির এই গুন্ডাগুলোর (এই নামেই আমরা ওই অঞ্চলে 'বিখ্যাত' ছিলাম কিনা!) মুখে ভয়ের ছাপ দেখে বুকিং অফিসের বাকি কাকুদের তো তাজ্‌ঝিম্‌ মাজ্‌ঝিম্‌ অবস্থা। যাইহোক অবশেষে জানতে পারলাম বাবাজী আর কেউ নয়, আমাদের ভাগবত চাচার সেই 'খোয়া হুলা লড়কা', রামেশ্বর। ভাবছেন তো ধড়ে প্রাণ এল! মোটেও নয়। প্রাণপাখি প্রায় উড়ান দেয় আর কি! একটা চিরচেনা সহজ, স্বাভাবিক সাধারণ মানুষের এইরকম ভয়ঙ্কর পরিবর্তন মেনে নেওয়ার মতো মনের জোর সেদিন আমাদের, বিশ্বাস করুন, ছিল না। যদিও আজ তা জলভাত। তারপর থেকে ওকে দেখলেই আমরা গুটিয়ে যেতাম, ভয় পেতাম, পালিয়ে যেতাম। ভাগবত চাচাও যে এই দিনরাত গাঁজা খাওয়া ছেলের ওপর খুশি ছিল তা তো নয়। এর জন্য 'সোসাইটি'তে ওর প্রেস্টিজটা বেশ একটু ঢিলেই হয়েছিল।

এইবার পরের গল্পে আসি। সে এক রথযাত্রার দিন। আগের দিন বাড়িতে পাঁপড় এসে গেছে, ফুটকড়াইও। রথের দিন বিকেলে খাওয়া হবে। একে আসাম, তায় আষাঢ় মাস, তায় রথের দিন। বৃষ্টি যে হবেই সে ব্যাপারে কোনো সন্দেহই কারো নেই। কিন্তু কী আশ্চয্যি!! সকাল থেকে নো মেঘ, ওনলি রোদ্দুর! সে বৃষ্টি হোক আর না হোক বেশ একটা ছুটির আমেজ। তার মধ্যেই মাথার ভেতর বিন্‌বিন্‌ করছে কদিন ধরে দেখা ওলিম্পিক সার্কাসের বড় বড় হোর্ডিং। গত সাড়ে তিনদিন ধরে দাদার সাথে কথা নেই। সামান্য একটা পেনসিল কাটার কলকে ঘিরে যে এমন একটা মনোমালিন্য হতে পারে আজ ভাবলেই হাসি পায়। সেই রকম একটা যাবজ্জীবনের আড়ি ভেঙে নতজানু হয়ে ভাবের ব্যবস্থা করা যে কী কঠিন (বা আনন্দের) সে কি আজকের একার ঘরের ছোটোরা বোঝে? সার্কাসের কথা দুজনে মিলে বাবাকে বলতেই বাবা বললেন আজ রথের দিন, প্রচণ্ড বৃষ্টি হবেই, অন্যদিন যেও। স্বপ্নভঙ্গের বেদনা গ্রাস করে আমাদের। হঠাৎ মা এসে বলল, কী যে বলো না! এই রকম খট্‌খটে রোদ দেখেও তুমি বৃষ্টির কথা ভাবতে পারলে! বলিহারি তোমার! বাবা আবার একটা কিছু বলতে যেতেই মায়ের সিদ্ধান্ত পেশ, কলিকালে রথের দিন বৃষ্টি হয় না। বাবা আর কথা না বাড়িয়ে বললেন, ঠিক আছে ছাতা নিয়ে যেও আর সারা দুপুর অঙ্ক করে যেও। বাবারা কেন যে এত ভালো আবার একই সঙ্গে কেন যে এত খারাপ হয় কে জানে! এটুকু পড়ে নিশ্চয়ই আপনাদের মনে হচ্ছে এ কি রে বাবা দুটো ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েকে একা একা সার্কাস দেখতে পাঠিয়ে দিল! এ কেমন অভিভাবক! কিন্তু বিশ্বাস করুন ওই ছোট্ট জায়গাটায় বাবা-মাই শুধু অভিভাবক হতেন না। যে কোনো কাকু বা জেঠু বা কাকিমা থাকলেই তাঁদের হাতের মতোই নিরাপদ থাকতে জানতাম আমরা।

সার্কাসের এরিনার মধ্যে গিয়ে সে কি উত্তেজনা! কত আলো! কত চেয়ার! কত বড় গ্যালারি! ঝিংকাচিকা ঝিংকাচিকা বাজনা! ওই তো চিত্রাদির মা জেঠিমা! ওই তো আমার নাচের ক্লাসের সহপাঠি অমিতদা! বাদাম, লজেঞ্চুস্‌, মকাই সব নিয়ে গ্যাঁট হয়ে বসলাম। ছাতা-টাতা আর আনিনি। শুরু হল একের পর এক খেলা। মোটরবাইকের খেলা, হাতির খেলা, সিংহের খেলা চলার ফাঁকে ফাঁকে জোকারদের মজায়

বুঁদ হয়ে আছি। হঠাৎ বাইরের একটা গুম্‌গুম্‌ আওয়াজে ভেতরটা যেন কেঁপে উঠল। পাত্তা না দিয়ে আবারো মগ্ন হলাম। প্রস্তুতি শুরু হল দড়ির ওপর হাঁটার খেলার। ঝলমলে ছোটোছোটো জামা পড়া ফুটফুটে মেয়েরা! মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে আছি। নিজেকে দু-একবার ভেবেও নিলাম ওদের জায়গায়। দড়িতে উঠল ওরা। বাইরের আওয়াজ আবার কাঁপিয়ে দিল। হাঁটল ওরা। তাঁবুর ভেতরে ঝপঝপিয়ে জল পড়ছে। লাফাল ওরা। ডিগবাজিও খেলো। বাইরের জল তাঁবুর নীচে দিয়ে ঢুকছে! ওরা হাতে লাল-নীল ছাতা নিল, দড়ির ওপরও বৃষ্টি আর বাইরে কড়্‌কড়াৎ!! মুহুর্মুহু। ঝলমলে আলো নিভে গেল। শুধু বিদ্যুতের ঝলকানি। দাদার হাত চেপে ধরেছি, আর নিজের ঠোঁট কামড়ে। মা বলেছে, কাঁদে বোকারা। গলা শুনে বুঝলাম অমিতদা দাদার পাশে অন্ধকার হাতড়ে চলে এসেছে। কিন্তু চিত্রাদিরা কই?!! আমার যে খুব ভয় করছে! একটু বোকা হতে ইচ্ছে করছে! ভিড়ের উজান বেয়ে বেরিয়ে এলাম বাইরে। অন্ধকার অন্ধকার আর অন্ধকার। বিদ্যুতের ঝলকানি, ঝলকানি আর ঝলকানি। পৃথিবী ভাসানো বৃষ্টি। অনুভব করলাম আমি যেন কার ঘাড়ে। দাদামণি!!! চিৎকার করে উঠলাম। 'ডর না করিও মুন্নি! হম্‌ রামাশ্বরো বা। বাবুয়া হ্যায় মেরে পাস্‌' আমি আঁকড়ে ধরলাম ওর ফেট্টি বাঁধা মাথা। অন্যসময় দূর থেকে ওর গাঁজার গন্ধ, ওর বহুদিন স্নান না করা গায়ের গন্ধ আমায় বমি করায় আজ কিচ্ছু মনেই এল না। এক মস্ত লড়াইয়ের পর বাড়ি এলাম। লাইট নেই ঘরে। হ্যারিকেনের আলোয় দেখতে পেলাম মা প্রায় অজ্ঞানের মতো হয়ে বিছানায়। আমাদের অমন রাশভারি বাবা আমাদের প্রায় বুকে জড়িয়েই ধরল। ও, বলতে ভুলে গেছি অমিতদা আমাদের সঙ্গেই আমাদের বাড়ি এসেছে। রামেশ্বর মিলিয়ে গেল ওর ডেরায়। স্টোভের আগুনে রান্না ডিম-আলু সেদ্ধ ভাত খেয়ে রাত প্রায় সাড়ে দশটার পর বৃষ্টি একটু ধরতেই বাবা অমিতদাকে নিয়ে রওনা দিলেন ওর বাড়িতে। টেলিফোনের বালাই ছিল না তখন, ওর বাবা-মা যে চিন্তা করবেন। পরের দিন মা রামাশ্রয়কে ডাকল গতকালের ঘটনা শোনার জন্য। আমরা যখন সার্কাসে যাচ্ছিলাম তখন ওর সাথে আমাদের দেখা হয়েছিল। আমাকে বলেওছিল যে ও-ও সার্কাসে যাবে আমাদের সঙ্গে। আমরা দু ভাই-বোন তো ওকে পাত্তাই দিই নি। পরে যখন ওইরকম তুফান শুরু হল তখন ও ছুটে সার্কাসের তাঁবুর বাইরে অপেক্ষা করছিল। ও নাকি জানত যে আমি ছোটো থেকেই 'ডরপোক'! ভাবুন!

---

# টিউশন ক্লাস বনাম স্কুল

**সৌম্যশ্রী সেন**

'টিউশন আর ইউনিট টেস্ট এর চাপে
''শিক্ষা'' আড়ালেতে কাঁদে
সে মুক্ত হতে চায়
পথ খুঁজে না পায়।'

আমি একজন কলা বিভাগের ছাত্রী। আগের ছাত্রাবস্থা থেকে এখনকার ছাত্রাবস্থায় অনেক পার্থক্য এসেছে। মনের পরিবর্তন ঘটেছে। এখন আর মন চুপ করে সব উপদেশ শোনে না, মেনে নেয় না। এখন মন প্রশ্ন করে সমাজের কাছে। জানতে চায় বুঝতে চায়। বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে অনেক ব্যক্তি অনেক কথা বলে থাকেন। আমি আমার ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতা থেকেই এই সম্বন্ধে কিছু কথা বলতে চাই।

বর্তমান সমাজ সবকিছু 'রেডিমেড' জিনিস পছন্দ করে। সে পোশাক পরিচ্ছদ থেকে, খাওয়াদাওয়া এমনকি পড়াশোনার ক্ষেত্রে 'Notes'। সবকিছু রেডিমেড চাই। তবে এই প্রতিযোগিতায় একজন জয়ী হতে পারবে—এই মনোভাব সকলের মনে গেঁথে গেছে। তাই পঞ্চম শ্রেণী থেকেই আমাদের অভিভাবকগণ প্রত্যেকটি বিষয়ের জন্য একটি করে শিক্ষক নিযুক্ত করেন। তাই প্রাইভেট টিউশন ও স্কুলের পড়ার ভারে ছাত্রছাত্রীদের প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে ওঠে। কিন্তু সত্যিই কি তাই? পড়াশোনা কি কখনো আমাদের কাছে বোঝা হতে পারে? আমার মনে হয় কখনোই না। শিক্ষা কখনোই বোঝা হতে পারে না। টিউশন ক্লাস, স্কুল সবকিছু বিষয়ে ১০০% নম্বর আনতে গিয়ে একজন শিক্ষার্থীর কাছে 'শিক্ষা' একসময় বোঝা এবং ভবিষ্যতে শুধুমাত্র একটি ভালো প্রতিষ্ঠানের কর্মী হিসেবে নিযুক্ত হবার পন্থা হয়ে দাঁড়িয়েছে। শিক্ষাকে ভালোবেসে, তার সম্পূর্ণ রসাস্বাদন করার প্রবণতা বর্তমানে শিক্ষার্থীদের মধ্যে কমে আসছে।

চাঁদের আলো যেমন স্নিগ্ধ, সুন্দর তেমনি চাঁদের গায়ে দাগও আছে। প্রাইভেট টিউশন পড়তে গেলে আমরা আরও জ্ঞান সংগ্রহ করতে পারব, নিজেদের আরও সেই বিষয়টিতে

সমৃদ্ধ করতে পারব কিন্তু বর্তমানের শিক্ষাব্যবস্থায় টিউশনের টেস্ট না স্কুলের ইউনিট টেস্ট কোনটির জন্য আগে তৈরি হবে সেটা বুঝে উঠতেই সময় চলে যায়। কিন্তু প্রত্যেক মানুষের সৃজনশীল কিছু ক্ষমতা থাকে। 'রেডিমেড Notes' পাবার ফলে নিজের চিন্তাশক্তির মৃত্যু ঘটে।

বর্তমানে সাজেসটিভ পদ্ধতিতে শিক্ষার সীমা বেঁধে দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু শিক্ষার পরিধি বিশাল। আমাদের এই ক্ষুদ্র জীবনে সম্পূর্ণভাবে শিক্ষার রসাস্বাদন করা সম্ভব হয়ে উঠবে না। কিন্তু বর্তমানে শিক্ষার্থীরা যদি নিজেদের চিন্তাশীলতা দিয়ে শিক্ষা গ্রহণ করে তাহলে গতানুগতিক শিক্ষা ব্যবস্থার কিছু পরিবর্তন ঘটবে।

এখন আমরা টিউশন ক্লাস করতে গিয়ে স্কুলে অনুপস্থিতির মাত্রা বাড়তে থাকে। একজন শিক্ষার্থী শুধুমাত্র পুঁথিগত শিক্ষায় শিক্ষিত হলেই চলবে না। চরিত্রগঠন, নৈতিকতা, নিয়মানুবর্তিতা, সামাজিক কর্তব্য পালন করার জ্ঞান প্রভৃতি জ্ঞানও তার মধ্যে থাকা দরকার। আমরা স্কুলের শিক্ষকদের কাছ থেকে যে জ্ঞান লাভ করতে পারি বর্তমানে সেগুলি থেকে আমরা বঞ্চিত হই। আমাদের সমাজের চাই সুদক্ষ, সুবিচারকৌশলী সম্পন্ন শিক্ষকগণ। আমাদের চাই 'বঙ্কুবাবুর' মতো শিক্ষকগণ, ('বঙ্কুবাবুর বন্ধু' সত্যজিৎ রায়ের লেখা) যাঁরা গল্পচ্ছলে সমগ্র বিশ্বের জ্ঞান আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরবেন।

বিদ্যালয় ও টিউশন এই দুই পরিবেশের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে বিদ্যার্থীকে পরিপূর্ণরূপে শিক্ষা দেবার প্রয়াস দরকার। এই শিক্ষার দৌড়ের প্রতিযোগিতায় হয়তো অজান্তে আমরা অনেক কিছু শিক্ষালাভ করা থেকেই বঞ্চিত থাকছি। শুধুই পুঁথিগত বিদ্যা এবং ৯৯% নম্বরই একজন মানুষকে সম্পূর্ণরূপে 'শিক্ষিত' বলে প্রমাণ করার জন্য যথেষ্ট নয়। শিক্ষার্থীদের নিজেদের চিন্তাধারাকে উন্মুক্ত করে সমাজের কাছে তুলে ধরবার চেষ্টা গতানুগতিক শিক্ষার ক্ষেত্রে জোয়ারে আনতে পারে।

বিদ্যার্থী এবং শিক্ষকদের সমানভাবে নতুন এক শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলন করার জন্য উদ্যোগ নিতে হবে। ভবিষ্যতে নতুন নতুন সৃষ্টির জন্য শিক্ষার্থীদের শিক্ষকদের সাহায্য একান্ত কাম্য। শুধুই বইমুখী শিক্ষা নয় সামাজিক ক্ষেত্রেও শিক্ষার্থীদের জ্ঞান দেওয়ার জন্য আগের গুরু শিক্ষার্থীর যে সম্পর্ক ছিল তা বর্তমানেও একান্ত জরুরি।

---

# একটি অসামপ্ত ভ্রমণ কাহিনী

**অর্কপ্রিয়া দাস**

*গত সংখ্যায় প্রকাশিত পরের অংশ-এরপর...*

7th October অনেক রাতে রামেশ্বরম যাবার জন্য ট্রেন ধরলাম। 8th October খুব ভোরে আমরা রামেশ্বরমে পৌছলাম। সমুদ্রের ওপর দিয়ে ভোর রাতে যখন ট্রেনটা যাচ্ছিল তখন দিদা আমাকে ডাকল। দেখলাম সমুদ্রের ওপর দিয়ে ট্রেনটা যাচ্ছে। মনে হলো যেন জলের ওপর দিয়েই ট্রেনটা যাচ্ছে।

স্টেশন থেকে আমরা সবাই Auto-তে করে ভারত সেবাশ্রমে উঠলাম। অনেকটা জায়গা নিয়ে এখানকার আশ্রম। সুন্দর বাগান ও বেশ সাজানো। সকালে তাড়াতাড়ি সবাই স্নান করে Breakfast করে মন্দিরে গেলাম এখানকার Bus-a করে, খুব বেশি দূরে নয়। দাদুর কাছে শুনলাম এখানকার বাসে দু টাকা করে টিকিট। মন্দিরটা খুবই বড়। দেখতে অনেকটা সময় লাগল। সারা মন্দিরের গায়ে কত নকশা করা। তারপর আশ্রমে সবাই ফিরে এলাম। এখানে সবাই প্রসাদ খেলাম। তারপর সবাই একটু বিশ্রাম নিলাম। বিকালে Bus-এ করেই গেলাম সমুদ্রের ধারে। শুনলাম ওখান থেকে শ্রীলঙ্কা খুব কাছেই। রাতের বেলায় আলো দেখা যায়। সবাই ক্লান্ত ছিলাম তাই আশ্রমে তাড়াতাড়ি ফিরে এলাম।

পরদিন Auto করে Local Sight Scene করতে গেলাম। কাছাকাছি রামতীর্থম, সীতাতীর্থম, লক্ষণতীর্থম সব দেখলাম। সবচেয়ে আশ্চর্য যে জলেতে যে পাথর ভাসে তা দেখলাম। রামায়ণে হনুমানদের পাথর দিয়ে তৈরি সেতুর কথা মনে পড়ে গেল। অনেকেই চেষ্টা করল পাথরটা জলে ডোবাবার কিন্তু কেউ ডোবাতে পারল না। এরপর আমরা ধুনস্কোডিতে গেলাম। ওটা শহর থেকে বেশ দূরে। অনেকে স্নান করছিল। কিন্তু আমরা করিনি। ফেরার পথে আমরা আমাদের Ex. Presedent APJ Abdul Kalam-এর বাড়িতে গেলাম, বাড়িটা এখন একটা ছোটো Museaum ওনার জন্মস্থান এখানেই।

এরপর 10th October সকালে আমরা ট্রেন ধরে

মাদুরাই গেলাম। এখানে Station থেকে একটু দূরে hotel-এ উঠলাম। স্নান খাওয়া করে একটু rest নিয়ে আমরা মীনাক্ষী মন্দিরে গেলাম। এতো সুন্দর মন্দিরটা রাতের আলোতে আরো ভালো লাগল। সবটা দেখা হল না। বাইরে থেকে Dinner করে তাড়াতাড়ি Hotel-এ ফিরে এলাম। পরদিন স্নান করে আবার মন্দিরে গেলাম। রাতেও গিয়েছিলাম সমস্ত মন্দিরটা ঘুড়তে পা ব্যথা করছিল। ভেতরে বসে খানিকটা বিশ্রাম নিলাম। Dinner করে hotel-এ ফিরলাম।

12th October Madurai থেকে Chennai ফিরলাম। Howrah যাবার ট্রেন অনেক রাতে। মনটা ভালো নেই, এবার বাড়ি ফিরতে হবে। অবশ্য ট্রেনে উঠে ভালো লাগলো কারণ অনেকদিন পর বাড়ি ফিরছি। অবশেষে 14th October আমরা সবাই যে যার বাড়ি ফিরলাম।

## হিজিবিজি

### মুদ্রা

যদি বলি এখন সকাল
তৃণা বলে কই
এখন তো সকাল কেটে
বেলা বেড়েছে বই।

দাদাভাই এর আরো কথা
শুধু সকাল - সকাল হলে
দুপুর আসবে কখন রে
এক্কেবারে রাতে

দেখতো ওরা কী যে করে
ভেবেই পাই না আমি
অত কিছু ভাবতে না
বলেছিল চিনিমামি।

তবু এসব ভাবায় আমায়
আমি তো ভাবি না
চিন্তাগুলো কেমন করে
ঢোকে জানি না।

তবু দেখ রোজই
সকাল থেকে রাত তো হবেই
প্রতিদিনই দিন কাটবে
ঠিক এভাবেই।

কাটছে দিন ফুরিয়ে যাচ্ছে সব
ভাবি আমি কোথায় শেষ
এভাবেই তো প্রতিদিন
নতুন কে পাই বেশ।

## সময়

### রোদ্দুর

চটপট তাড়াতাড়ি শিগ্‌গিরি কর
সময়ের কাজগুলো সময়েতে সার
কোন কাজে কী সময়
কে বলে দেবে
দেখতো উত্তর পাও কিনা
ভেবে।

আমি বলি সময়ের
বাবা মা কে ডেকে
তাড়াহুড়ো করে কেন
সময়কে নিয়ে

সময়ের সাথে সাথে
আছে শুধু ঘড়ি
কেমন হবে যদি ওকে বহু করি।

থাকব নিজের মতো কোন
তাড়া ছাড়া
শুনতে হবে না কোন কাজ
হয় না আমার দ্বারা

একদিন ঘুম থেকে উঠে যদি দেখি
সময়ের তালিকাটা হারিয়েছে একি?

যত রাগ দেখাই না
মনে মনে খুশি
সময় ছাড়া চলব
সে ইচ্ছেয় ভাসি।

সায়ন গুপ্ত
তৃতীয় শ্রেণি

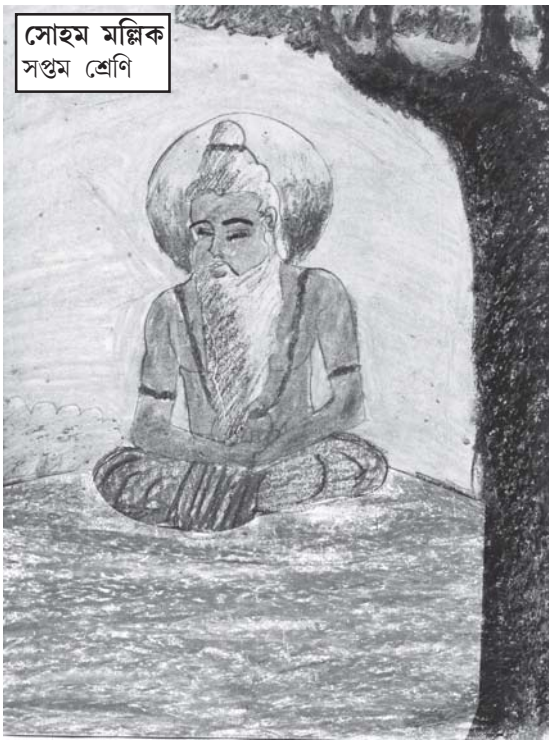
সোহম মল্লিক
সপ্তম শ্রেণি

মৌমিতা বাসু
চতুর্থ শ্রেণি

প্রবন্ধ, গল্প ও অনান্য

# Children and Cancer

**Dr. Bani Deb**

Cancer accounts for a major cause of death in Indian children next to infection and malnutrition. Because of major advances in diagnosis, multi-modality treatment, development of routine use of combined chemotherapy and improved supportive care, cure rate in childhood cancer has increased.

Cancer rate in adults increases with increasing age. In children, relatively wide age variability exists during development with two peaks, in early childhood and in adolescence.

Now question is when do we suspect cancer? Fever and vomiting are common in children. Any prolonged fever, instead of giving paracetamol , parents must consult doctor. Similarly, prolonged vomiting specially associated with headache should have doctor's attention. An active child becoming lethargic must be a matter of concern.

Parents must visit doctors if they find lump anywhere in the body. Bleeding spots on the skin should not be ignored.

Risk factors for childhood cancer comprise a diverse array from genetic process involved in control of cellular growth and development. Environment plays a large role. In childhood cancer, ionizing radiation exposure tops the list. Cigarette smoking (even passive), some viruses, pesticides, parenteral occupational chemical exposure are associated with pediatric cancer.

The World Health Organization's International Agency of Research and Cancer (IARC) has recently classified radio frequency electromagnetic fields as "possibly carcinogenic to human." Risk of cell phone falls in this category in children unlike adults, children have body cells that are rapidly dividing and tissues are growing. Hence the cells are more sensitive to radiation. Also, the thickness of the skull is less compared to adults. The area of brain exposed to non-ionizing radiation from cell phones is large vis-à-vis adults. On May 31, 2011, The council of Europe's parliamentary assembly recommended restrictions on the use of mobile phones in all schools, thus making them healthier place for children (*The Hindu* 9.6.11 http://www.cancer.gov/cancertopics/factsheet/risk/cellphones).

At present the latest chemotherapy, radiotherapy and skilled surgery are available for children of our country. With financial support from various organization our children also can have better and longer life like children of developed country.

# Marriage–an outdated, yet socially recognized institution

**Ananya Chakraborty**

What is Marriage and why is the concept over-estimated by the Indian constitution? This thought often bugs me in my spare time. Marriage is nothing but a defunct and an outdated institution unless one of the partners accepts and admits being unequal to the other. But like everything, it has to have a valid argument behind it.

While studying the world divorce rates, I came up with some very interesting findings. India has the lowest divorce rate of 1.1%, the UK about 42.6% and the US and Sweden about 55%. The more "progressive and advanced" the society, higher is the divorce rate. As per my experience and knowledge, "progressive" is simply accepting the change in the woman's place at home and otherwise.

A marital relationship where one is dependent on the other is an unequal relationship. It gives more power to the one who is not dependent, and so the marriage survives. It's the weakness that keeps it going, and not the strength. What a misfortune of destiny!!! But that's the way it has been and most of us willingly succumb to it. I still remember one of my friend's fabulous statement in her drunken state once – "In a marriage, one partner got to dish out the bullshit and the other partner got to take it, because if none of them takes it, and both dish is out, then there is just a pile of bullshit in the middle."

Something has changed in the past 100 years that had remained constant since the dawn of man — the place of woman in the house and society. She was no longer just happy being part of an agenda, because she had an agenda of her own. Rightfully so! She wanted more. Seismic change in the social order, you see? Sadly enough, the changing scenario still depends on a decadent system called marriage.

Marriage is socially encouraged and legally accepted, and this makes the compulsion to stay in a marriage more important than being happy in a marriage. If you are two independent, free-thinking individuals, then suggest you not to look for security that really offers you no security at all. If there is a gap in any relationship, then no marriage can keep it together; and if it is meant to survive fighting all odds, no marriage tag is required to keep it together.

No legal existence can surpass the depth of mental dependence and emotional bonding. If we follow this truth and nurture the thought, we can truly understand and value human relationship.

---

# GOD PARTICLE

**Subhendu Tosh**

With scientists having spotted a sub-atomic particle consistent with the Higg's boson or 'God Particle', question are being asked about the practical applications of the discovery.

The detector and magnetic technology employed to detect Higgs boson like new particle could find use in MRI and PET scans, it would be quite a while before the actual application of Higgs boson is understood.

The find would help scientists to probe mysteries of the universe like the nature of dark matter.

Higgs boson gives mass its attributes like inertia and gravity. So theoretically, if we are able to control the mass, we can reduce inertia.

**SatyendraNath Bose (1894-1974)**

Bose was born in Kolkata, the eldest of seven children. His ancestral home was in village Bara Jagulia, in the Nadia district, about 48 kms from Kolkata. Bose attended Hindu School in Kolkata and latter attended Presidency College in Kolkata, earning the highest marks at each institution which yet to be surpassed while fellow student Meghnad Saha came second. Bose joined the University of Calcutta as a research scholar in 1916 and started his studies in the theory of relativity. He married Ushabati at the age of 20. They had nine children. Two of them died in their early childhood.

Bose, along with Saha, presented several papers in theoretical physics and pure mathematics from 1918 onwards. In 1924, Bose wrote a paper deriving Plank's quantum radiation law without any reference to classical physics by using a novel way of counting states with identical particles. Though not accepted at once for publication, he sent the article directly to Albert Einstien in Germany which was latter translated into German by Einstein and submitted it on Bose's behalf to the prestigious *Zeitschrift fur Physik.*

The reason that Bose's interpretation produced accurate results was that since photons are indistinguishable from each other, one cannot treat any two photons having equal energy as being two distinct identifiable photons. This interpretation is now called Bose-Einstein statistics. Einstein adopted the idea and extended it to atoms. This led to the prediction of the existence of phenomena which became known as Bose-Einstein condensate, a dense collection of bosons (which are particles with integer spin, named after Bose). Several Nobel Prizes was awarded for research related to the concepts of the boson, Bose-Einstein statistics and Bose-Einstein condensate but Bose himself was not awarded the Nobel Prize.

**Peter Higgs :**

Higgs was born in 1929 in Newcastle upon Tyne, England. His family moving around because of his father's job and later World War II, Higgs missed his early schooling and was taught at home. At the age of 17 Higgs moved to city of London School, where he specialized in mathematics, then to King's College London where he graduated with a first class honours in Physics, and later achieved a master's degree, and a Ph.D. Higgs has two sons and two grandchildren, and all live in Edinburgh.

At Edinburgh Higgs became interested in mass, developing the idea that particles were massless when the universe began, acquiring mass a fraction of a second later as a result of interacting with a theoretical field (which became known as Higgs field). Higgs postulated that this field permeates space, giving all elementary subatomic particles that interact with it their mass.

While the Higgs field is postulated to confer mass on quarks and leptons, it causes only a tiny portion of the masses of other subatomic particles, such as protons and neutrons. In these, gluons that bind quarks together confer most of the particle mass.

The original basis of Higgs' work came from the Japanese-born theorist and Nobel Prize winner YoichiroNambu from the University of Chicago. Professor Nambu had proposed a theory known as spontaneous symmetry breaking based on what was known to happen in superconductivity in condensed matter; however, the theory predicted massless particles (the Goldstone's theorem), a clearly incorrect prediction.

Higgs "flash on inspiration" came while walking in the Cairngorms in1964 and he wrote a short paper exploiting a loophole in Goldstone's theorem and published it in *Physics Letters,* a European physics journal edited at CERN, in Switzerland, later that year. Higgs wrote a second paper describing a theoretical model (now called the Higgs mechanism), but the paper was rejected. Higgs wrote an extra paragraph and sent his paper to *Physical Review Letters,* another leading physics journal, which published it later that year. Other physicists, Robert Brout and Francois Englert and Gerald Guralnik, C. R. Hagen and Tom Kibble had reached similar conclusions about the same time. In the published version Higgs quotes Brout and Englert and the third paper quotes the previous ones. The three papers written on this boson discovery by Higgs, Guralnik, Hagen, Kibble, Brout and Englert were each recognized asmilestone papers by *Physical Review Letters* 50th anniversary celebration.

On 13th December 2011, CERN reported that two independent experiments at the Large Hadron Collider had seen "tantalising hints" of the existence of Higgs boson.

On 4th July 2012, CERN announced the ATLAS and CMS experiments has seen strong indications for the presence of a new particle, which could be Higgs boson, in the mass region around 126 GeV.

Higgs is an atheist, and is displeased that the Higgs particle is nicknamed the "God Particle", as he believes the term "might offend people who are religious". Usually this nickname for the Higgs boson is attributed to Leon Lederman, the author of the book *The God Particle: If the Universe is the Answer,*

*What is the Question?,*but the name is the result of the insistence of Lederman's publisher: Lederman had originally intended to refer to it as the "goddamn particle".

**GOD PARTICLE**

In particle physics, elementary physics and forces give rise to the world around us. Physicists explain the behaviour of these particles and how they interact using the Standard Model-a widely accepted framework based on quantum fields and symmetries believed to explain most of the world around us. Initially, when this model was being developed, it seemed that the mathematics behind the model, which was satisfactory in areas already tested, would forbid elementary particles from having any mass, which showed clearly that these initial models were incomplete. In 1964, three groups of physicists almost simultaneously released papers describing how masses could be given to these particles, using an approach known as spontaneous symmetry breaking. Symmetry breaking allows the necessary particles to acquire mass, without breaking other parts of particle physics theory that were already believed reasonably correct. This idea became known as Higgs mechanism, and laterexperiments confirm that such a mechanism does exist–but they could not show exactly how it happens.

It should be noted that more than one source of mass is known to exist, but in the Standard Model the term "Higgs mechanism" almost always signifies the mechanism responsible for electroweak symmetry breaking, and it is this question whose answer gas been exceedingly difficult to prove.

The leading and simplest theory for how this effect takes place in nature is that if a particular kind of "field" (known as the Higgs field) existed, which in contrast to the more familiar gravitational field and electromagnetic field had a constant strength everywhere, then this field would give rise to a Higgs mechanism in nature, and would therefore allow particles interacting with this field to acquire a mass. During the 1960s and 1970s the Standard Model of physics was developed on the basis, and it included a prediction and requirement that for these things to be true, there had to be an undiscovered fundamental particle as the counterpart of this field. This particle would be Higgs boson (the massive and fleetingly short-lived boson associated with a Higgs field). If the Higgs boson were confirmed to exist, as the Standard Model suggested, then scientists could be satisfied that this part of the Standard Model was fundamentally correct. If the Higgs boson were not proved to exist, then other theories would need to be considered as candidates instead.

The Standard Model also made clear that the existence of the Higgs boson would be very difficult to demonstrate. The Higgs boson requires so much energy to create (compared to many other fundamental particles) that it also requires a massive particle accelerator to create energetic enough to create. And even then, the particle collisions are much more likely to produce other particles than the Higgs boson. Once a Higgs boson is created it will exist for only a tiny fraction of a second before decaying into other particles-so quickly that it cannot be directly detected–and can be detected only by identifying the results of its immediate decay and analysing them to show they were probably created from a Higgs boson. However, there are many other processes that produce similar decay signatures, making the Higgs particle a proverbial "needle-in-a-haystack".

The same theories that suggest the Higgs field and boson exist, also predict how often different kinds of collision and decay should be observed. Given a suitable accelerator and appropriate detectors, scientists can record trillions of a particle colliding, analyse the data for collisions likely to be a Higgs boson, and then perform further analysis to test how likely it is that the results combined show the Higgs boson does exist and the results are not just due to other chance processes. If the analysis shows there is less than about one chance in

a million of the results happening by chance, then there is a strong evidence the Higgs boson or another unknown particle is involved. If this is the case, then further tests can demonstrate the new particle's properties, whether or not it is a Higgs boson, and what this means for modern physics theories. If no new particle were found then this would conclusively show which theories can be ruled out and suggest which other theories to examine instead, which would also be very significant.

Experiments to try to show whether the Higgs boson did or did not exist began in the 1980s, but until the 2000s it could only be said that certain areas are plausible, or ruled out. In 2008 the Large Hadron Collider was inaugurated, being the most powerful particle accelerator ever built. It was designed especially for this experiment, and other very-high-energy tests of the Standard Model. In 2010 it began its primary research role: to prove whether or not the Higgs boson exists.

In late 2011, two of the LHC's experiments independently began to suggest 'hints' of a Higgs boson detection around 125 GeV. In July 2012 CERN announced evidence of discovery of a boson with an energy level and other properties consistent with those expected in a Higgs boson. Further work is necessary for the evidence to be considered conclusive (or disproved). If the newly discovered particle is indeed the Higgs boson, attention will turn to consider whether its characteristics match one of the extant versions of the Standard Model. The CERN data include clues that additional bosons or similar-mass particles may have been discovered as well as, or instead of, the Higgs itself. If a different boson were confirmed, it would allow and require the development of new theories to supplant the current Standard Model.

# Postcard from Cuba

**Pathik Mitra**

Castro's Cuba is blinking in the glare of Deng Xiaoping's socialist market economy.

April 27, 2012, after finishing my office-works in Houston I decided to go to Cuba. Because of US bans it is impossible to fly directly to Cuba from the US. I had to fly to Havana, Cuba's capital, via the Bahamas and exit via Panama. The Cuban government is smart enough not to permanently stamp tourism visas. This means that when tourists leave the island nation of 11 million people only 140km off the coast of mainland US, Customs in the US will never know they have been in Cuba.

I was in Cuba as part of a 10-day tourism visit to see firsthand one of the remaining bastions of a fading ideology that clings to Cuba as Fidel Castro's ageing legacy to this country. His 80-year old brother Raul is now President but there is little doubt about 85-year old Fidel's residual power. It was also an opportunity for me to seea nickel laterite plant in Moa Bay Cuba. Soviet Russia built the plant in 1959 based on pressure acid leach (PAL) process for extraction of nickel and cobalt, first time in the world. It is amazing to see that the plant engineered by Soviet technology in 1959 is still working. But it needs upgrading. In 1990s I worked in similar projects in Australia, Canada and French controlled Pacific island nation New Caledonia.

Cuba is the most populous island country in the Caribbean and boasts an infant mortality rate lower than many western developed countries, its average life expectancy is a respectable 77.64 years and the literacy rate is 99.8 per cent. So what is the future of communism in Cuba and the world's five remaining communist countries, now that its dream of world domination is long gone?

Western world's largest trading partner China has modified its communist ideology to the point that neither comrades Vladimir Lenin nor Karl Marx would recognise it. China is a communist country with a capitalist economy. Since 1978, policies introduced by Deng Xiaoping have lifted hundreds of millions, more than 700 million Chinese people out of poverty and transformed the country world's second largest economy. Today China consumes more automobile per annum than the USA does. American icon GM makes more cars in China than in the USA. A couple years ago China surpassed Germany as the world's largest exporter of engineered and manufactured goods. Successive leaders since Deng Xiaoping have revolutionised* China through market reforms.

Deng started these reforms from the position ofa leader of the Communist Party of China, never being China's head of the state or government. He was paramount leader of the People's Republic of China from 1978 to 1992 and shared his power with two other men Chen Yun and Li Xiannian.

China's first revolution was in 1949 when the communist defeated the nationalist regime under Chian Kai-shek. The second revolution, just as important, was Deng's modernisation started in 1978.

If it were not for the rapid growth of Chinese economy USA and entire Western world would have gone into deeper recession during the global financial crisis. So capitalist world owes a debt to China's second revolution and creation of market economy by the communist party. Karl Marx must be turning in his grave.

North Korea with a trade embargo and sanction imposed by UN is a troublesome economic basket case but Vietnam with its 90.5 million is one of Asia's most open economies. Cheap labour cost in Vietnam invites a great deal of Chinese and US manufacturing subcontracts. US are also building port facilities in Vietnam and US-French companies are also involved there in building oil & gas plants. Laos has a population of only 6.5 million. Although it is a popular tourism destination, subsistence agriculture makes up half of the country's gross domestic product and 80 per cent of employment. It receives development aid from International Monetary Fund.

Cuba is different story. It remains an ideological inspiration to left-leaning Latin America's Presidents such as Venezuela's Hugo Chavez, Paraguay's Fernando Lugo, Bolivia's Evo Morales and Ecuador's Rafael Correa. Indeed Correa refused to join his 31 regional counterparts at the April meeting of the Sixth summit of the Americas in Cartagena in Columbia, with Barrack Obama because of the US's refusal to invite Cuba. Chavez, who recently returned from cancer treatment in Havana, sends Cuba 80,000 to 90,000 barrels of oil daily at heavily subsidised prices in exchange for 30,000 doctors and teachers from Cuba.

But the main powerhouse of Latin American economies is following a different direction. The left- of-centre government in Brazil since the leadership of President Luiz Inacio Lula da Silva has followed a very independent economic growth path. Argentina has its own political culture. Chile, Peru and Colombia have governments committed to foreign investment and international trade.

Even the politics of Cuba are changing. Late last year the government announced moves to legalise the buying and selling of private property. The number of computers and mobile phones is increasing but the economy is still unproductive. The government plans moving 30 per cent of its workforce to the private sector in three years but the pace of change is painfully slow.

Raul is not Deng. There is speculation that when Castros die the Government's time is limited.

In Venezuela, Chavez announces he is running for re-election but is spending less time in the spotlight. His establishment of an advisory committee could be a sign he is losing his year-long battle with cancer. This

could mean there would eventually be a more moderate president in Venezuela. Cuba could be losing an invaluable ally.

Indeed Correa's absentation from the summit may have been a strategic move to establish himself as the leftist heir apparent to Chavez in Latin America.

So what is Cuba's long term future?

Economically, China and Vietnam have abandoned communism as envisaged by Lenin and Marx. Cuba will have to rapidly accelerate its reforms or go the way of the Soviet Union.

Two recent signs are worth noting. There are reports Cuba could soon end many travel restrictions. If Cuba opens its doors and the US lifts its embargo there will be world stampede to enjoy the wonders of its food, music, landscape, geographic locations and hospitality of its people.

The island culture is a melting pot of African and Spanish ancestry with a powerful musical legacy embracing son and other musical styles such as salsa, rumba and mambo. Cuban cuisine is a mix of Spanish and Caribbean cooking with fantastic spices and sauces used freely on plantains, black beans and rice.

As a tourism destination it is worth the effort to get here. The damaging 50-year-old US trade embargo, the longest in modern history, did not stop Cuba expanding its investment in tourism infrastructure which saw tourism surpass sugar as the nation's most significant source of hard currency 15 years ago.

# আহির

**দেবযানী ভট্টাচার্য**

ভোর হয়ে এলো দেখ। রডোডেনড্রনগুলোর মাথা পুরুষালী সবুজ আর পেলব লাল এর পূর্বরাগে মাখামাখি। সামনের পাহাড়টার গায়ে এখনো মিঠে ঘুমের আলসে কুয়াসা চাদর। শুনতে পাচ্ছো দামাল পাথরগুলোর শরীর ভেঙ্গে বয়ে চলা পাহাড়ি ঝোরাটার অবাধ্য খলখলে হাসি? জানো, এই ঝোরাটাকে কেন জানিনা আমার নন্দিনী বলে ডাকতে ভারী ভালো লাগে। ও যেন পার্বত্য অচলায়তন ভেঙ্গে পাথরের হিয়া জাগাতেই জন্মেছে! এতো ফুল এতো পাখি সবাই যেন এই নন্দিনী-ঝোরাটারই সহচরী। এই ভাঙ্গনের উৎসবের বেশ খানিক অংশীদার। আর এই যে ঝাঁকে ঝাঁকে প্রজাপতি, ওরা তো ঝোরার শুক-সারি। ফুলের কানে পাখির কানে ডাক পৌঁছানোর ভার নিয়েছে। জানলার কাঁচে অজস্র ফটিক-জল এর সোহাগ চুম্বন। যেন কাল সারাটা রাত শিশিরগুলো ভালোবাসাবাসিতেই কাটিয়েছে! অ্যাই, হাসছো ক্যানো? ওহ, আমরাও তো কাল গোটা রাত...শোনোনা, খানিক পথ চলবে এই নরম আলোয়? পাশাপাশি পায়ে পায়ে পেরিয়ে যাব চরাই উতরাই, পাহাড়ী জনপদ অপাপবিদ্ধ মানুষজন, দীর্ঘ ঋজু বনস্পতি। গাঢ় ফিকে কালচে নীলচে সবুজে ডুবে যাব আমরা। তারপর যখন হঠাৎ বৃষ্টি কাঁপন ধরাবে দেহের তন্ত্রীতে, নিজের ঘন উষ্ণতায় জড়িয়ে নিও আমায়, আমিও ভরিয়ে দেব সুগন্ধী আদুরে ওম-এ। ঠিক ওই বিরাট গাছটার শরীর জড়িয়ে থাকা ফুল উপচানো লতাটির মতো...

'মেমসাহেব, উঠিয়ে, সাঁজ হো গ্যয়ি। চায়ে লাউ?'

মাথার ভিতর যেন কতদূর থেকে চুঁয়ে এলো কথাগুলো। ঘোর লাগা চোখটা মেলতেই চশমার স্পষ্ট কাঁচে পরিস্কার বাস্তব। মঞ্জরী চ্যাটার্জী বা মিঠুল (যদিও এ নামে ডাকবার আজ আর কেউ নেই!) ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। লেখার টেবিলেই। মহুল-মিঠুল এর কুড়ি বাইশ বছর আগেকার দিনলিপির একটা ছেঁড়া পাতা কেমন করে যেন উড়ে এসে পড়েছিল প্রৌঢ় মানবীর চোখের পাতায়! এই তরাই এই তো প্রথম অভিসারে এসেছিলেন তিনি, মহুল এর বাহু ছুঁয়ে, সক্কল কে লুকিয়ে...

কে জানে আজ কোথায় আছে মহুল। ক্যামন আছে? বিয়ে করেছে? নাকি এখনো বাউন্ডলে আঁকিয়েটাই রয়ে গ্যালো? পারিবারিক নেতিবাচকতার অসহায় শিকার দুটি মানুষ আজ এসে অপরের থেকে যোজন দূরত্বে! তবু আজো কেন ফিরে ফিরে আসো মহুল? জীবন যে সায়াহ্নে। আহির গাইবার কাল তো ফুরিয়েছে। এখন ভূপালি, পূরবী পেরিয়ে দরবারীর অন্তর্লীন হাহাকার এর লগ্ন!

চশমার কাঁচটা আরেকটু মুছে নিলেন মঞ্জরী দেবী...

# একা

## পারমিতা

আজ সবাই যখন বাড়ি থেকে বেড়িয়ে গেল, নমিতা একা একা দাঁড়িয়ে রইল। কেমন যেন ছবিগুলো ভেসে উঠল একটার পর একটা, জীবনের মূল মন্ত্রে কোথায় বলতো কোথায় আমরা খুশি হই? কি জানি নমিতা ভাবে আর ভাবে। কখনো মনে হয় আমিই বোধহয় একা, আমিই বোধহয় সবচেয়ে দুঃখী। না, অনিমা সবিতা ওদের তো আরও খারাপ অবস্থা। অভীক মামার ছেলেটা যে পড়তে পড়তে কোথায় হারিয়ে গেল, টুনী পিসির মেয়ের বর আবার বিয়ে করেছে। যাই হোক সবারই তো একাই থাকা। ঝুলনের মেজো মাসি, এখনো বাড়িতে ছেলে বৌ খেতে দেয়। ভালোবাসে বল, পেনশন আছে তবুও চলে যায় বৃদ্ধাশ্রমে। বলে, এখানে সব আছে কিন্তু বড় একা। রামু বৌদি একদম একা নয়—সকাল থেকে তাড়াতাড়ি রান্না-বান্না সেরে স্নান করে ঠাকুর কে দিয়ে খেয়ে বসে পড়ে আড্ডায়। উঃ কি মজা, কত লোকের কত কথা, সব জেনে ফেলি। মায়া জেঠী বলে T.V.-র Serial-র ছেলেমেয়েদের সঙ্গে আমি আছি। সংসারে কে আছে, কে নেই, কিছু দরকার নেই। শুধু সময় মতো T.V. খুলে দিও ব্যাস! এখন ওর বর এসেছে, কাল এর শাশুড়ীর হার্ট এ্যাটাক, পড়শু কে গাড়ী কিনল, সিরিয়ালের সাথে সাথেই জীবন চলে।

বিদ্যুৎ বাবুর সেই কবে কার অভ্যেস এ ফ্ল্যাট ও ফ্ল্যাট থেকে বাচ্চাদের ডেকে এনে গল্প করে, অঙ্ক শেখায়। আর প্রদীপদা গান করাতে থাকে রবীন্দ্র জয়ন্তী থেকে বিজয়া সম্মেলনী—একা আর কই। একা আমরাই, আবার আমরাই সবার মধ্যে। সব কিছু থেকে বাদ দিলে তো শুধু শেষ, হবে ইতি। তা না করে হোক না শুরু। যা ছিল তা বাঁচানোর, একা নয় সবার সাথে জীবনের যে কটা দিন আছে একটু সবার জন্য। সবার সাথে। সবার কথা ভাবতে ভাবতে বা সবার জন্য করতে করতে। সবার সঙ্গে থাকতে থাকতে একদিন আমি পরিপূর্ণ হয়ে উঠব।

---

# শোধ

## দেবযানী ভট্টাচার্য

'মাঝে মাঝে কি যেন এক অব্যক্ত কষ্টে কুঁকড়ে যাই, কোন এক জানা-না জানা কারনে সকাল হয়না আমার, আবছায়া কোনো এক ধারনায় বঞ্চিত মনে হয় নিজেকে, মনে হয় ঠকে গেলাম আবারও, পেলাম না নিজেকে উজাড় করে ভালবাসবার স্বীকৃতিটুকুও, পেলাম না কোনো প্রতিদান, খুব খুব একলা লাগে নিজেকে, তখন তোমার বুকের মধ্যে মুখ ডুবিয়ে খুব খানিকটা কাঁদতে ইচ্ছে করে বাবা...'

—পিহু পিহু, দেখবে এসো কে এসেছেন।

শাশুড়ির গলা পেয়েই খাতাটা বন্ধ করে দেয় পিহু। কে জানে কে এলো আবার। প্রথম প্রথম বেশ লাগত এই নতুন বৌ দেখতে আসার ব্যাপারটা, কিন্তু এখন একটা ক্লান্তিকর একঘেয়েমি এসে গেছে যেন। হয়েও তো গেল মাস ছয়েক, এখনো কি আর সে নতুন আছে নাকি! তার উপর মায়ের এই খাতাটা আজ দুদিন ধরে যেন চুম্বকের মত টানছে তাকে! গত পরশু শনিবার গেছিল ও বাড়ি। দাদা-বৌদিরা গেছে বেড়াতে, বাড়িতে বাবা একলা। তাই ভেবেছিল একবার ঘুরে আসি। তো গিয়ে এঘর ওঘর করতে করতে মনে হল মায়ের আলমারীটা বহুদিন খোলা হয় না, একটু রোদ্দুরে দেওয়া দরকার শাড়ি জামাগুলো। সেই শাড়ি ঘাঁটতে ঘাঁটতেই এই খাতাখানি পেয়ে যায়। ভারী অবাক হয়েছিল প্রথমটায়। মা ডাইরি লিখত! কি লিখত? কখন লিখত? যতদূর মনে পড়ে সারাদিন তো ঘরকন্নাতেই কেটে যেত মায়ের। পাতা ওল্টাতে লাগল এলোমেলো। তারপর কি জানি কি ভেবে বাবাকে কিছু না বলেই খাতাটা নিয়ে চলে এল এবাড়ি। আসা ইস্তক পড়বার সময়ই পায়নি। রবিবার শমীক থাকে বাড়িতে, এক মুহূর্ত সময় পায়না পিহু নিজেকে নিয়ে বসবার। তার স্বামীটিকে সে ঠিক চিনে উঠতে পারেনি। বড়ো ব্যস্ত বড়ো গম্ভীর। বিয়ে হয়েছে বটে, সম্পর্কও তৈরি হয়েছে সবরকম, কিন্তু নিজের দাবী মেটানো ছাড়া তার দিকে খুব একটা নজর আছে কিনা ঠিক বুঝে উঠতে পারেনা সে। আরেকটু সময় লাগবে হয়ত এই ভেবে নিজেকে বুঝিয়েছে পিহু। শ্বশুর-শাশুড়িকেও কিছু বলে উঠতে পারেনি।

শাশুড়ি শব্দটা মনে পড়তেই চিন্তার সুতোটা ছিঁড়ে গেল। দুদ্দাড় নেমে এল নিচে।

—কি হল পিহু? কখন থেকে ডাকছি তোমায়, কি করছিলে?

—এই তো মা, স্নান সারছিলাম তো তাই একটু...

বেমালুম মিথ্যে বলে দেয় পিহু!

নিজেকে বাঁচানোর জন্য নাকি নিজের মাকেও!

—বিকেলটা তার জানলায় বেশ সাজিয়ে গুছিয়েই আসে। যদিও ফ্ল্যাটের আগ্রাসন এদিকেও থাবা বসিয়েছে, তবু বাড়ির লাগোয়া এই খেলার মাঠ আর ধারে ধারে গাছগুলো দমচাপা হতে দেয়নি দোতলাটাকে। সবুজের ফ্রেমে নীল সাদা রক্তিম রং এর খেলায় ভোর থেকে সন্ধ্যে! ভারী ভালো লাগে দেখতে। কিন্তু আজ সেদিকে মন নেই মেয়েটার। তন্ময় হয়ে পড়ে চলেছে মায়ের খাতাখানি। মেয়ের চোখের সামনে খুলে যাচ্ছে মায়ের হৃদকুঠুরীর একের পর এক বন্ধ দরজা। দুই অসমকালিন নারীর মধ্যে রচিত হচ্ছে অনুভবের সেতু। যন্ত্রণায় নীল হয়ে যাচ্ছে পিহু! ক্ষোভে রাগে চুরমার করে ফেলতে ইচ্ছে করছে সবকিছু। এতো কষ্ট পেয়েছ মা তুমি! এত কষ্ট! একটা বিশ্বাসঘাতক লম্পটের সাথে সংসার করে গেছ, তার জান্তব ক্ষুধা মেটাতে গিয়ে নিজেকে নিস্পেষিত করেছ রাতের পর রাত। সন্তান উৎপাদন করেছ তার পিতৃত্বের ধ্বজা ওড়ানোর তাগিদে। শুধু সয়ে গেছ মা, শুধু সয়ে গেছ! প্রতিবাদ করতে পারনি মাথার উপর থেকে ছাদ চলে যাবার ভয়ে। মা হারা মেয়ে, বাউন্ডুলে বাবা, ঠাকুমারা বিয়ে দিয়ে নিয়ে না আসলে তো রাস্তার শেয়াল কুকুরে ছিঁড়ে খেত! তাই দিনের পর দিন ঘরের কুকুরের কাছে আত্মসমর্পন!

—সন্ধ্যে গড়িয়ে রাত নামে। বড় তেতো বিষণ্ণ রাত। ঠায় বসে থাকে পিহু। কি করবে সে এখন? কি করা উচিত তার? বাবার সামনে গিয়ে দাঁড়াবে? উফ! বাবা ভাবতেও ঘেন্নায় শরীরটা গুলিয়ে উঠছে। নিজেকে ওই লোকটার সন্তান ভাববার চেয়ে মৃত্যুও যেন অনেক অনেক বেশি কাঙ্খিত। না, সে কালই যাবে ওবাড়ি। দাদা বৌদির সামনেই বাবাকে প্রশ্ন করবে সে। কৈফিয়ত চাইবে এই ঘৃন্য আচরণের। ভালমানুষের মুখোশটা একটানে খুলে দেবে। দিনের পর দিন মায়ের উপর হয়ে চলা অত্যাচারের প্রতিশোধ নেবেই সে।

. . .ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ায় পিহু। ঘড়ির দিকে চোখ পড়ে। ওহ! অনেকটা রাত হয়ে গেছে যে। শাশুড়ি মা কে রান্নায় সাহায্য করতে হবে। দীর্ন বুকটার দরজায় আগল টেনে রান্নাঘরের দিকে এগোয়।

. . .শমীকের ফেরার কোনো নির্দিষ্ট সময় নেই। বেশ রাত করেই বাড়ি ফেরে সে। খেয়েও আসে বেশিরভাগ দিনই। প্রথম দিকে পিহু জিজ্ঞাসা করাতে উত্তর পেয়েছে 'অফিসে মিটিং থাকে, ওখানেই খেয়ে নিতে হয়।' মাঝে মাঝে তো ফিরেই শুয়ে পড়ে। একটা দুটো কথা পিহু বললে তার মাপা উত্তর, ব্যস। তারপর অবশ্য রাত আরো গড়ালে ঘুমের ঘোরে টেনে নেয় পিহুকে। নিজেকে পরিতৃপ্ত করে। আবার ঘুমে তলিয়ে যায়। অর্থ খুঁজে পায়না পিহু। ধোঁয়াশা লাগে এই ব্যবহার। আজ অবশ্য সে স্থির করেই নিয়েছে যে শমীক ফিরলে আলোচনায় বসবে। সব জানাতে হবে তো। কাল সে যা করতে চলেছে তার আঁচ তো এবাড়িতে আসবেই। তাই আগে থেকেই জানিয়ে রাখা ভাল। কে বলতে পারে হয়ত শমীক তার সাথ দেবে। সেতো আজকালকার ছেলে। শিক্ষিত ভদ্র বিনয়ী।

—বেড সাইড ল্যাম্পটা নেভাতে যাচ্ছিল শমীক, আজও খেয়েই ফিরেছে, বারণ করল পিহু। পাশে এসে বসল।

—তোমার সাথে একটু কথা আছে।

—বল।

ক্লান্ত গলায় বলে চলে পিহু, সবটুকু। কি করবে তাও বলে।

—তুমি কি পাগল হয়েছ!

চাপা গলায় হিসহিস করে বলে ওঠে শমীক। হতবাক হয়ে পড়ে পিহু। নিজেকে পাগল প্রতিপন্ন করার মত কি করেছে সে! আবার ফুসিয়ে ওঠে শমীক।

—তুমি একদম যাবে না ও বাড়ি। কাউকে কিচ্ছু বলবে না। ইওর মম ইজ ডেড পিহু, এখন এসব পুরোনো কাসুন্দি ঘেঁটে কি লাভ? তোমার মা কবে কি মানসিক অবস্থায় কি সব ছাঁইপাশ লিখে রেখে গেছেন তার উপর ভিত্তি করে তোমার বাবার মত বিখ্যাত স্যোসাল ওয়ারকার কে যাতা বলতে পারনা তুমি! ওনার সমাজে একটা রেপুটেশান আছে। ইন ফ্যাক্ট তোমাকে বিয়েই করেছি আমি তোমার বাবার অর্থ প্রতিপত্তি ক্ষমতা দেখে। সেটা ধুলোয় মিশলে আমারো অনেক ক্ষতি। আর এর সাথে আমাদের ফ্যামিলি প্রেস্টিজ ও জড়িয়ে আছে। তোমার এই উদ্ভট সিদ্ধান্তের জন্য আমরা আমাদের সম্মান শেষ করতে পারিনা। ওরকম একটু আধটু এক্সট্রা ম্যারিট্যাল আফ্যেয়ার কম বেশি সব পুরুষেরি থাকে। ইটস আ সাইন অব ম্যাচুরিটি। এটা নিয়ে এতো রিঅ্যাক্ট করবার কি আছে? পড়োনি একসময় কোন বাবুর কটা রাঁড় তাই দিয়ে বাবুদের আভিজাত্য মাপা হত। তোমার এই টিপিক্যাল খাঁটি ভাবনা চিন্তা জাস্ট বাদ দাও। লাইফ একটাই, লেটস এনজয়!

গড নোজ কোনদিন হয়তো তুমি আমার আর রীতার র‍্যাপো নিয়েও আমায় অ্যাকিউজ করবে।

(ওহ শীট!)

নিজেকে সামলানোর চেষ্টা করে শমীক, বলতে বলতে হুঁশ ছিলনা তার। মুখ ফসকে বেড়িয়ে পড়ল রীতার নাম! এখন উপায়?

ওকি! পিহু অমনভাবে তাকিয়ে আছে ক্যানো? কি রকম অপ্রকৃতিস্থ দেখাচ্ছে ওকে। কি বিড়বিড় করছে ও? চোখগুলো যেন ঠিকরে বেড়িয়ে আসছে! শমীকের দিকে টলতে টলতে এগিয়ে আসছে ক্যানো ও ভাবে?

—তুমিও তুমিও! এইবার আমার কাছে সব পরিস্কার হয়ে আসছে শমীক সরকার! কেন তোমার অফিস থেকে ফিরতে এতো রাত হয়, কেন রোজ রোজ তোমার অফিস ট্যুর, কেন ঘুমের ঘোরে কামনা মেটানো একটা শরীর ছাড়া আমি তোমার কাছে আর কিচ্ছু না। সব সব। ও মা গো! আমি কি করব মা, আমি কি করব!

শমীকের দিকে এগিয়ে আসতে আসতে হঠাৎ থমকে দাঁড়ালো পিহু। মাথার মধ্যে কার যেন কণ্ঠস্বর, মা মা! মা যেন কিছু বলছে ওকে...সোজা সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে গেল পিহু।

যাক, ডোজে কাজ হয়েছে মনে হলো। এখন নিশ্চয়ই ঠাকুর ঘরে গিয়ে একটু কাঁদবে। এছাড়া পিহুর মত নেকু-পুষু-মুনু মেয়ের ক্ষমতার দৌড় আর কতদূর হবে!

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে শুয়ে পড়ে শমীক।

. . .ভোরের আলো ফুটেছে। শাশুড়ি মা মর্নিং ওয়াকে বেরোতে গিয়ে দেখেন সদর দরজা খুলে বেড়িয়ে যাচ্ছে পিহু।

—এতো ভোরে কোথায় যাচ্ছো?

—ওবাড়ী যাচ্ছি। বাবার সাথে জরুরি দরকার আছে।

এগিয়ে যায় পিহু। হঠাৎ থমকে দাঁড়ায়। পিছন ফিরে বলে ওঠে,

—মা, আপনার ছেলেকে ঘুম পাড়িয়ে রেখে এসেছি। আজ আর ও অফিস যাবে না। আর কোনোদিনই রাত করে...

কি যেন বলতে বলতে বেড়িয়ে যায় পিহু, শেষটা ঠিক শুনতে পান না শাশুড়ি মা।

. . .ট্যাক্সি তে উঠে বসল পিহু। ড্রাইভারকে বাড়ীর রাস্তার নির্দেশ দিয়ে আঁচলে ঢাকা রক্তমাখা ছুরিটার গায়ে বড়ো আদরে হাত বোলাল! মাথার মধ্যে মায়ের কণ্ঠস্বর

'শেষ করে দে বুবলি, শেষ করে দে বিশ্বাসঘাতক-গুলোকে। আমি পারিনি। নিজের ভিতর হাহাকার করে পচেগলে মরেছি। কিন্তু তুই ওদের ছাড়িস না মা! নিজের ভিতরের দেবতাটার এতো অপমান সহ্য করতে নেই মা। মরতে যাচ্ছিলি তো, বেশ, মরতেই যদি হয় পৃথিবী থেকে কটা পাপ শেষ করে মর মা, শেষ করে মর। আমি তোকে বরণ করে নেব।'

# ও পারেতে সর্বসুখ

**অধ্যাপক ডঃ মধুসূদন ভট্টাচার্য্য**

স্যার পলিটিক্যাল লোক নাকি? ক্লাসে গুঞ্জন ওঠে, বেরিয়ে আসার সময় ক্লাস থেকে কথাটা কানে আসে নীলেশ দস্তিদারের, আজই তাঁর প্রথম ক্লাস। মনে ভয় ছিল, পারবে তো টিচিং।

বিভাগীয় প্রধান ডেকে বললেন জয়েন করতেই, নীলু এই বিষয়টা আমি পড়াই, রেজিস্ট্রিটা ধর, তুমিই পড়াও বিষয়টা।

অধ্যাপক সেন আমাকে চিন্তিত দেখে মৃদুহাস্যে বলেন, পারবে বলেই তো দিচ্ছি। আরে আমরা তো কয়েকবছরে অবসর নেবো, শিক্ষক তৈরী করতে হবে না।

মাথা হেঁটে করে দাঁড়িয়ে থাকি, ভাবি-এ তো গুরুদায়িত্ব, একদম Final Year-এর Industrial Management। আনন্দও হয় স্যারের আমার ওপর আস্থা দেখে। কিন্তু একটা নার্ভাসও লাগে।

এই বাড়ীর তিনতলারই তিন নম্বর ঘরে ক্লাস, আজই, ১২টা ৫০ মিনিটে, ফোর্থ পিরিয়ড। বিকাল ৫টা নাগাদ একবার দেখা করো।

এখনো ঘন্টাখানেক হাতে সময় আছে। আনমনে বসার ঘরে যাই। উনি অবশ্য subject-এর syllabus-এর ফটোকপি ও দিয়েছেন, xerox তখনো আসেনি সেভাবে।

অপরাহ্নে অধ্যাপক সেনের রুমে গেলে উনি একটু আমার দিকে তাকান, সামান্য হেসে বলেন, বসো।

কেমন লাগলো, ভাল তো?

বুঝতে পারছি না ওঁরা কাছে কি রিপোর্ট পৌঁছেছে।

বলি, স্যার ভাল লেগেছে। ইন্ডাস্ট্রিতে ছিলাম, এখানে অন্যরকম অনুভূতি। আর আমার নিজের ছাত্রজীবনের কথা মনে পড়ছিল খুব। আমিও এই ঘরে ছাত্রাবস্থায় কত ক্লাস করেছি।

উনি মৃদু হাসছেন, সৌম্যমূর্ত্তি, খদ্দরের ধুতি, পাঞ্জাবি, আর জবরদস্ত কদমছাঁট গোঁফ।

নাও, তোমার এই semester-এর রুটিন। আরো বলেন, শোনো তোমার ক্লাসঘরের পিছনের দরজায় ছিলাম খানিকক্ষণ, তুমি ও ছাত্ররা আমায় দেখতে পাওনি অবশ্য।

বিপদ গুনি, হয়তো গড়বড় করেছি কিছু।

ক্লাসের প্রারম্ভ তো ভালই করেছ। তা যা দিয়ে শুরু করেছ তা কি তুমি নিজে বিশ্বাস কর?

নীরবে থাকি কিছুক্ষণ। পুরোপুরি স্যার। উনিও আমারও স্যার ছিলেন, এখনো ওনার সহকর্মী বলে নিজেকে ভাবতে পারি না।

কোনো অসুবিধে হলে জানাবে কেমন, পিতৃসম স্নেহ ঝরে পড়ছে।

দিন কাটে, অনেক উত্থান-পতনের পর প্রায় শেষ জীবনে উপনীত। স্মৃতিমেদুরতা কত মধুর, তা রোমন্থন করি আজ, বয়সটা যেন অনেক বছর পেছনে হাঁটে।

প্রযুক্তিবিদ হয়ে সব ধরণের কাজ করেছি, শরীর দিলে এখনো করি—কারখানা, বিশ্ববিদ্যালয়, অতিথি অধ্যাপক, consultancy, Assessment আরো কত সব। কিন্তু উপভোগ করেছি অধ্যাপনা, এ কথা অকপটে স্বীকার করতে কোন কুণ্ঠা লাগে না। বন্ধুবান্ধবরা যারা Industry-তে ছিল, সবাইয়ের গাড়ী বাড়ি। এখন অবশ্য অধ্যাপকশ্রেণী রীতিমত উচ্চ মধ্যবিত্ত, একটা লাভজনক পেশা অন্য পেশার মত অধ্যাপনাও। পেশা হওয়াতে কোনো ক্ষতি নেই অবশ্য যদি পেশাদারিত্ব থাকে যথাযথ। শিক্ষক কূলদের অনুরোধ এ মন্তব্যে দোষ নেবেন না, বরং বিবেকের আয়নায় দেখুন কি ঘটছে।

রাতে একটা/দুটো অবধি বহুদিনই থাকি আমার ছোট্ট পড়ার ঘরে, বইয়ে ঠাসা। আমার একটা বদবাতিক আছে কবিতা লেখার। যুবতী স্ত্রী এই নিয়ে গোঁসাও করে বিস্তর।

তুমিই শুধু অধ্যাপনা কর!

তা হবে কেন। তবে সবাইকার Intelligence তো একরকমের হয় না।

তুমি তো শুনেছি ভাল রেজাল্ট করেছিলে?

তার সঙ্গে গুলিয়ে ফেলো কেন যে পড়াতে গেলে তৈরি হয়ে যেতে হয় দস্তুরমতো, নইলে ছাত্রদের হুইশেল, বুঝলে ম্যাডাম।

দেখো রোজ রোজ এত রাত করে শুতে যাও, আমায়ও জেগে থাকতে হয়।

কেন শোবার ঘরতো আলাদা, চোখে আলো লাগছে বলতে পারবে না।

নেকুরাম অধ্যাপক একটা!

আমি যখন প্রথম দিন ক্লাসে যাই, আমার পুরো নাম বোর্ডে লিখে দিই। ছাত্ররা যেন আমায় শুধু ND বলেই না চেনে। দেখ আমার হাতে একটা কাঁচের পেপারওয়েট—এটা আমাদের দেশে তৈরি।

ছাত্ররা অবাক হয়ে যায়, ভাবে এর সঙ্গে Subject-এর কি সম্পর্ক।

বুঝি এটা। বলি নিজের দেশের এই তুচ্ছ বস্তুটা...। যা বলতে চাই, দেশকে ভালবাসো, তুমি খুব বড় প্রযুক্তিবিদ হলে, কিন্তু মাতৃভূমির ওপর তোমার যদি টান (Commitment) না থাকে, তাহলে দেশের কথা ভেবে নিশ্চয়ই কাজকর্ম করবে না। অথচ দেখো গরীবগুর্বো সাধারণ মানুষের আনুকূল্যে তোমরা প্রায় বিনা ব্যয়ে এখানে পড়ছো। দেশে অনেক চোখ ধাঁধানো শিক্ষিত লোকজন আছেন, কিন্তু ভারতীয় প্রায় নেই বললেই চলে। আমি মনে প্রাণে ভারতীয় খুবকমই দেখেছি। তোমরা ভারতীয় ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে কাজকর্ম করবে যাতে দেশের প্রতি তোমার যে ঋণ, যা অপ্রতিশোধ্য বাস্তবপক্ষে, তার অন্ততঃ কিছুটা প্রতিদান দিতে পারো।

কোনো অধ্যাপক তো এভাবে আমাদের কিছু বলেন নি, তাহলে কি ইনি পার্টি করেন!

দেখো বাবা, তিনরকমের পড়ানো, (এক) ক্লাসে শুধু লেকচার দেওয়া, (দুই) নোট দেওয়া মানে নোট dictate করা অথবা বোর্ডে লেখা এবং (তিন) লেকচার আর নোটের সমাহার। তোমাদের কোনটা পছন্দ?

ছাত্ররা নিরুত্তর।

তাই আর একটু প্রাঞ্জল করি আমার বক্তব্যটা। আমায় মুখোমুখি দেখবে। আমায় দেখবে ঠিকই তবে চক্ষুদ্বয় নোটের পাতায় অথবা Black board এর দিকে নিবদ্ধ যখন আমরা কদাচ মুখোমুখি হবো, তৃতীয় পদ্ধতিটি আগের দুটির সমন্বয় যখন যেটার প্রয়োজন।

স্যার, তৃতীয় পদ্ধতি, অনেক স্বর একযোগে।

আমি এটা আগেই জানি। আমরাও তো ছাত্র জীবনে এমনটাই চাইতাম। কিন্তু অনেকেই হতাশ করেছেন। সেই tradition সমানভাবে চলছে প্রায় পৃথিবীর সর্বত্রই।

বর্তমানে ফিরে আসি চকিতে। আচ্ছা অনেকে World Class Standard-এর কথা বলছেন—এ আমার কাছে

একটা বিরাট ধাঁধা। Innovation, Cutting-edge Technology আরো সব কত কি। আচ্ছা এগুলো কি খায় না মাথায় দেয়, কে জানে বাবা।

কি নীলু, আজ খুব ফুরফুরে মেজাজ দেখছি ক্লাসের পরে?

সহকর্মী, বয়সে কিছু বড় আমার চেয়ে, সুন্দর ফিগার, গ্রীকভাস্কর্য্যের গঠনশৈলীসম, complexion ও চক্ষুরঞ্জক, মৃদু ও মধুভাষি খগেনদা।

দাদা, আজ পড়িয়ে খুব তৃপ্তি পেলাম। খুব আনন্দ হচ্ছে।

কেন তুমি তো ভালই পড়াও। ছেলেরা তা তাই বলে, আরো বলে অবশ্য।

ঔৎসুক্য নিয়ে প্রশ্ন করি।

নাই বা শুন্‌লে।

তবে কাজ নেই, বলতে হবে না বলে একটু গম্ভীর হই।

তাহলে শোনো, শালার ND টা কিন্তু বড্ড Strict। প্রথম ঘণ্টায়ও দেরি করলে ক্লাসে ঢুকতে দেয় না। আর পড়া না করে আসলে stand up on the bench। আমরা দুদিন পরে কলকারখানা অফিস চালাবো আমাদের এমন হেনস্থা!

মৃদু হেসে বলি, তা বলুক গে, ওরা Discipline টা শিখুক, ওটা জীবনে বড় জরুরী। জানো খগেনদা, এ ব্যাপারটা আমায় আগেই বলেছেন কেমিস্ট্রির অধ্যাপক মিহিরবাবু।

আজ অপরাহ্ন বেলায় সন্দেহ জাগে, কটা ছাত্রকে ভারতীয় ভাবধারায় দীক্ষিত করতে পেরেছি। এখন সব ভারতীয় প্রযুক্তিবিদের Destination হচ্ছে USA, Canada, UK, Germany। তা যে কোন রকম কাজ নিয়েই হোক। আমি ব্যক্তিগত জীবনে দেখেছি অনেককে স্রেফ কোন মেশিন অপারেটারের কাজ করতে। ইদানীং অবশ্য IT-র যুগ, কতজন তো ঘণ্টামাফিক দস্তুরীতে computer-এ data feed করছে। তারা যখন ভারতে বেড়াতে আসে, তাদের কলার উঁচু, কত রোজগার তা টাকায় রূপান্তরিত করে বলে এত লাখ টাকা মাসে তলব পায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কিন্তু ঐ সব কাজ ওদেশের স্বল্পশিক্ষিত মেয়েরাই করে। তবে তো service Indian Engineer দের মতো পাওয়া যায় না, আর তলব ও বেশী। সময় ধরে আসে আর dot সময়েই অফিস ত্যাগ করে। আর ভিনদেশীয়রা? তাদের যেন সারাটা দিন কিনে নিয়েছে employer-রা। এ পাশ ও পাশ হলেই Fire, আবার চাকরী খোঁজো।

আমার কলেজ সহপাঠি এক বন্ধু ও দেশে বিয়ে করেছে। দেশে ফিরেছে হঠাৎই দেখা। বলি, কি রে ফিরলি?

না, ছুটি নিয়ে এসেছি। একটা Placement ভাল পেলে আর ফিরবো না।

কত Expectation?

বলে।

আরে এ-তো অনেক টাকা।

আমি তো ঐখানে এইরকমই পাই।

তুই কি মাইনে পাস টাকায়?

না, পাউন্ডে, আমি conversion করে বললাম।

সালটা বোধহয় ১৯৬৪/৬৫ হবে। এক পাউন্ড প্রায় ১২/১৩ টাকা।

এখন লোকে অবিশ্বাস করবে, আমার কিছু বলার নেই তাতে। বলি, তোর দেশে আর ফেরা হলো না রে।

ওর সঙ্গে আর দেখা হয়নি। তবে শুনেছি, ও UK-তে আছে। কতদিনের কথা!

একদিন অপরাহ্নে এক সহপাঠি সপুত্র হাজির বিশ্ববিদ্যালয়ে।

কুশল বিনিময় হয়। বলি, যুবকটি কে?

আমার পুত্র, ও states-এ Engineering পড়ছে।

তুই তো এখানে অতো ভালো চাকরিটা ছেড়ে গেলি রে। তা কাজকর্ম নিশ্চয়ই ভাল করছিস।

তোকে মিথ্যে বলবো না, লোভে পড়ে গেলাম, আমি এখন Draftsman-এর চাকরী করি Drawing Office-এ।

ছেলেকে বলে, তোকে এর কথা অনেক বলেছি, পরিচয় তো হল। তুই প্রতিষ্ঠানটা ঘুরেফিরে দেখ, আমার Alma Mater। আমরা দুই বন্ধুতে একটু গল্পগুজব করি।

জানিস, অতি লোভে তাঁতী নষ্ট। একটা কাজ করছি, তার জন্য তো Engineer-ই লাগে না। আর আমিই একটা বড় কোম্পানীর হোমরাচোমরা কর্তা ছিলাম বলতে গেলে। এখন পশতাই। কি আর হবে এত বছর হয়ে গেল, কি রকম হীনমন্যতায় ভুগি। অথচ এখানে ফেরার উপায় নেই, কে আমায় চাকরি দেবে এ বয়সে।

সালটা বোধহয় ১৯৮৫/৮৬ হবে।

মনটা উদাস হয়ে গেল সান্ত্বনা দেবার ভাষা নেই। আচ্ছা সরল, তুইতো এখানেও ভালই পেতিস।

নারে, ডলারের মোহ, আর বিদেশে থাকা মনে স্বর্গে বাস ধারণা ছিল, তবে আরো একটা ঘটনাও আমাকে বাধ্য করেছে ও চাকরিতে ইস্তফা দিতে। কাউকে এখনও পর্যন্ত বলিনি, তোর সঙ্গে শেয়ার করে নিলে বোধহয় আমার কষ্ট কিছু লাঘব হবে।

বেয়ারা চা দিয়ে যায়।

আগে গলাটা ভেজা, তারপরই না হয় আরম্ভ কর্‌বি।

কিন্তু খুব Secret রে।

বিশ্বাস না করলে বলিস না।

না না, তাতো বলিনি, জানি তোকে অসঙ্কোচে বলা যায়। কোথা থেকে যে শুরু করি, তাই ভাবছি।

তাতো হবে, ২০/২৫ বছর আগের কথা, তাই না।

হ্যাঁ ১৯৭৬ সাল, একটা চাকরি খুঁজতে লাগলাম অন্যত্র। offer পেতাম, কিন্তু Top Post-এর offer নেই। তা ছাড়া যা মাইনে পেতাম কাগজে সই করে, না সই করে তারো বেশি, উপরন্তু Perks ও অনেক। তার তুল্যমূল্য পেতে হবে, কিন্তু পাচ্ছি না।

তুই তো ও কোম্পানীতে বেশি দিন ছিলিস না।

না, সাকুল্যে তিন বছর। আমি 2nd man হিসেবে join করেছিলাম। ভালই ছিলাম।

একদিন CMD আমায় বললেন, আমার বাড়ীর AC-টায় কিছু Problem, দেখুন কি করা যায়।

CMD অবাঙালী, সম্ভবত মাড়োয়ারি ঠিক বলতে পারবো না, বাংলা ইংরাজীতে চোস্ত তিনি। মধ্যপ্রদেশ বেশ পরিমান মত স্ফীত।

বড় সাহেবের আদেশ। দুপুরেই অভিজাত এলাকায় সুরম্য প্রাসাদে হাজির হই। প্রকাশ্য গেট, প্রহরী ও মজুত।

পরিচয় দিই ও আসার কারণ বলি তাকে।

কাকে ফোন করে যেন প্রহরী।

একজন আর্দালী ব্যস্তসমস্ত হয়ে আমাকে নিয়ে যায় ড্রইং রুমে।

কোন AC টা গড়বড় করছে।

মাইজীর বেডরুমের, উনি তো এখন বিশ্রাম নিচ্ছেন।

আমি বরং অপেক্ষা করি এখানে।

একটা ফোনের ঝনঝনানি শুনতে পাই এবং অনতিবিলম্বে এক ভদ্রমহিলা হন্তদন্ত হয়ে আসছেন, বলেন, আমি ওঁর মিসেস, উনি ফোন করেছেন আপনি এসেছেন।

ভদ্রমহিলা সুন্দরী তন্বী, খুব বেশী হলে বছর তিরিশ হবে।

অবাক হই স্বামী-স্ত্রীর ফিগারে এত ফারাক!

বেয়ারাকে বললেন ঝরঝরে বাংলায়, চা নিয়ে আয়, কিছু একটা থাকে যেন। আপনার কি এখন অন্যত্র যাবার আছে?

না, তেমন কিছু নেই, আমি নতমুখে বলি। হাজার হোক, আমার ঊর্দ্ধতম কর্তৃপক্ষের মিসেস। কিন্তু এই মিসেসই কাল হলেন। আমার স্বাস্থ্যের কারণে ঐ চাকরী না ছেড়ে কোনো উপায় ছিল না।

আমি জিজ্ঞাসু সরল বোঝে। হ্যাঁরে তোকে সব খুলেই বলছি।

হ্যাঁরে, মাঝে মাঝে এটা ওটা ছুতো করে আমায় ডেকে পাঠাতে লাগলেন উনি। মনিবের মিসেসের বিরক্তি উৎপাদন করা কোনো কাজের কথা নয়।

তাছাড়া, সত্যি বলতে কি, নীরস কারখানার চেয়ে সযুর্বাত ড্রইংরুম তো ভাল লাগারই কথা।

হেসে বলি, তুই তো ছিলিস একনম্বরের লেডিকিলার ছাত্রজীবনে।

দেখ, ও বয়সে সবাই একটু এধার ওধার করে।

তুমি বাবা কিন্তু তা ছিলে না।

ও মৃদু বিষণ্ণ হেসে বলে, হ্যাঁ যা বলছিলাম, ভদ্রমাহিলার সঙ্গ উপভোগও করতাম। ক্রমশঃ তা অন্তরঙ্গতায় পর্য্যবসিত হল। বুঝতে পারি, ভদ্রমহিলা ওর স্বামীর ওপর অত্যন্ত বিরক্ত।

কেন আমাদের ওনাকে তো ভালই লাগে।

হঠাৎই ফুঁফিয়ে কান্না ওনার। সর্বনাশ, কি দোষ করলাম অজান্তে! চুপ করে বসে আছে, আর তো করার কিছু নেই।

ও আমার জীবনটা নষ্ট করে দিয়েছে। ওর কোনো ক্ষমতাই নেই। শরীরের জ্বালা জুড়োতে পারি না। কি হবে প্রাসাদ নিয়ে, ধনসম্পত্তি নিয়ে, বল না তুমি?

আমাকে তুমি করে ফেলেছেন, ভাবি এ মুহূর্তের আবেগ। না, তা নয়।

এসো এপাশে, বলে আমার হাত ধরে টানেন। এই আমার শোবার ঘর, আলাদা করে নিয়েছি রাগে ঘেন্নায়।

আমাকে যে এতো ডাকেন, উনি রাগ করেন না?

অক্ষম পুরুষের আবার ক্রোধ!

ঘন্টাখানের পরে বলি, এবার আমায় যেতে হবে কিন্তু।

কেন আজ তো তোমার হাফডে।

স্ত্রীকে নিয়ে বেরোতে হবে একটু।

তোমার স্ত্রী খুব ভাগ্যবতী, তুমি স্বামী হিসেবে খুব ভাল। বুঝলাম তা বিলক্ষণ। তুমি আমায় আপনি আপনি করবে না তো আর।

দুজনেই তৃপ্ত, বিদায় নিই।

আমার স্ত্রী বলে, কোথায় যাওয়া হয়েছিল, গায়ে এত পারফিউমের সুবাস, আ ওটা কি গালে, কিসে কেটেছে?

বিপদ গুনি। স্বাভাবিক হতে চেষ্টা করি, চলো রেডি হয়ে নাও, আমি তো রেডি হয়েই আছি।

যে চুলোয় গিয়েছিলে সেখানেই যাও, বলে বেডরুমের দরজা দড়াম করে বন্ধ করে।

অনেক অনুনয় বিনয় করি, দুয়ার কিন্তু খোলে না।

যাচ্চলে রাগ করে বেরোতে যাচ্ছি, বসের ফোন, বাড়িতে ডিনারের আমন্ত্রণ আজই।

বেডরুমের দরজায় গিয়ে করাঘাত করি। কোনো সাড়া নেই। আমি কিন্তু রাতে আজ খাবো না। বসে থেকো না যেন।

ডিনার খুব উপাদেয়, ওরা দু'জন আর আমি। বেশ খানিকক্ষণ পরে বস আমায় বলেন, আমার একটা কাজ আছে জরুরী, ঘন্টা খানেকের মত, আমি না ফিরলে কিন্তু মিসেসকে একলা ফেলে যাবেন না।

আমি একটু অবাক হই ঘটনার আকস্মিকতায়।

এটা বুঝতে পেরে শ্রীমতি বলে, কাজ না ছাই, তোমাকে ছাড়পত্র দিয়ে গেল। মদ গিলে আসবে একপেট।

প্রথম প্রথম খেলাটা উপভোগ করতাম। ছাড়পত্র তো নয়, আমায় ডিউটি দিয়ে গেলেন ওর স্ত্রীর যত্ন নিতে।

কে কার যত্ন নেয়। আপ্যায়নের ঠেলায় আমার নাভিশ্বাস। আমার স্বাস্থ্য বিদ্রোহ করতে লাগলো।

তার দোষ কি, অতি ব্যবহারে তাইতো নিয়ম। কিন্তু ওর ক্ষুধা উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে। আমি ক্ষীণকায় হচ্ছি।

তখনি হঠাৎ একটা চাকরি জুটে যায়, USA পাড়ি দিই আত্মরক্ষার্থে।

সব শুন্‌লি তো, কেমন রগরগে উপন্যাসের মত না? বলে ম্লান হাসে বন্ধুবর।

আরে উপন্যাস তো জীবনেরই গল্প।

এরই নাম জীবন!

সবাই ভাবি, ওপারেতে সর্বসুখ আমার বিশ্বাস।

---

# আমার দশভুজা

## কিন্নর রায়

খুব ছেলেবেলায়, প্রায় ফি বছরই দুর্গাপুজো আর দোলের আগে আমার সারা গা জুড়ে প্রথমে ছ্যাঁক ছ্যাঁক। তারপর তো ধুম জ্বর। সে জ্বর এমনই যে গায়ে হাত দিয়ে বোঝা যায় না। কপাল ছুঁয়েও নয়। যা হয় সবটাই ভেতরে, ভেতরে। গোটা গা-ই তো শ্বেত পাথরের মেঝে যেমন হয়, তেমন ঠাণ্ডা। তবু মা জিভ দেখতেন, চোখের পাতা টেনে, তুলে দেখতেন। তারপর উনোনে পাঁচন ফোটাতে বসতেন। নিমের ছাল ইত্যাদি প্রভৃতি দিয়ে সে যে কী হাকুচ তেতো, বলে বোঝাতে পারব না। খেলেই বমি হয়ে যায় আর কি! তবু খেতে হত। ওষুধ বলতে ওটাই। এটা ১৯৫৯-৬০-৬১ সালের কথা বলছি। রেল চাকুরে বাবার মাইনে তখন বড় জোর শ চারেক। 'গেলের পাঁচন' বলে একটা কথা অনেক পরে শুনি। সে যে কী বস্তু বলে বোঝাতে পারব না।

দুর্গাপুজোর ঠিক পর পরই আসত গারসি সংক্রান্তি। আশ্বিন মাসের শেষ দিনে লক্ষ্মী-অলক্ষ্মীর বত্‌তো। একেবারে যাকে বলে হলায় গলায় দুই বন্ধু শেয়ালনী আর শকুনি। মরে গিয়ে পরজন্মে লক্ষ্মী আর অলক্ষ্মী হয়ে মর্তলোকে জন্মাল। মরণের সময় শকুনি তার বুকের মাংস নাতি-নাতনিদের, পায়ের মাংস ছেলেপুলেদের দিয়ে গেল। তারপর ডুব দিল গঙ্গায়। আর উঠল না।

শেয়ালনীও জলে ডুবল। তারপর পরজন্মে শকুনি হল লক্ষ্মী। শেয়ালনী অলক্ষ্মী। এই বততো অখণ্ড বঙ্গের ফরিদপুর জেলার। মা করতেন। তাঁকে এই ব্রতটি দিয়েছিলেন হাওড়ার বালির ৬৭ নম্বর গোস্বামী পাড়া লেনের বিমলা ভট্টাচার্য। সেই মহিলাও ছিলেন দারুণ মানুষ।

লক্ষ্মী-অলক্ষ্মীর ব্রতে লাগত শাপলা ফুল, শাপলা ডাঁটা, শালুক। কলাইয়ের ডাল, উড়ির চাল। আকাশে তখন বর্ষা কেটে যাওয়া পেখম তোলা শাদা শাদা মেঘ। নীল আকাশের গায়ে গায়ে তাদের যেমন খুশি ভেসে বেড়ান দেখে পাখা মেলে ময়ূরের কথা মনে পড়ে যেতে পারে।

মা বলতেন শেয়ালনী-শকুনির গপপো। লক্ষ্মী-অলক্ষ্মীর ব্রতকথা। এক ধানীপানি—বর্ধিষ্ণু গৃহস্থের ঘরে গারসি সংক্রান্তির দিন লক্ষ্মী-অলক্ষ্মীর ব্রত করতেন এয়োস্ত্রী শাশুড়ি-মা। তিনি গত হওয়ার পর তাঁর সাত সাতটি পুত্রবধূ, তাঁরাও শাশুড়ি-মায়ের দেওয়া ব্রত পালন করেন। এমন সময় একদিন—

১৯৬৫-র শরতের আগে আগে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ লেগেছিল। তখন ভারতের প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রী। তার স্ত্রী ললিতা শাস্ত্রী। লালবাহাদুর শাস্ত্রী আগে রেলমন্ত্রী ছিলেন, কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভায়। একটি বড় ট্রেন দুর্ঘটনার পর তিনি মন্ত্রীসভা থেকে পদত্যাগ করেছিলেন। পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট তখন ফৌজি আয়ুর খান। আমাদের 'ন্যাট', 'ভ্যামপায়ার' যুদ্ধ বিমান একদম ফরদাফাঁই করে দিচ্ছে পাকিস্তানের 'স্যাবার জেট' আর 'বি-৫২' বোমারু বিমানদের। 'ন্যাট', 'ভ্যামপায়ার'—সবই ব্রিটিশ রাজের ফেলে যাওয়া বাতিল মাল। তাকেই সামান্য উন্নত করে আমাদের অস্ত্র

বিজ্ঞানীরা যাকে বলে একেবারে ধুন্ধুমার বাধিয়ে দিলেন। সেই সঙ্গে 'প্যাটন' ট্যাঙ্কেরও দফারফা করল ইনডিয়ান ফৌজ। স্যাবার জেট, বি-৫২, প্যাটন ট্যাঙ্ক—সবই আমেরিকানদের দেওয়া। তখনকার লিন্ডন বি জনসন প্রশাসন না কি 'কমিউনিস্ট জুজু' ঠেকাতে এসব দিয়েছে পাকিস্তানকে।

সেই শরতেও খুব জ্বর এল আমার। বুক ভর্তি সর্দি। রাতে সাঁই সাঁই টান। নিশ্বাসের কষ্ট। মা পুরনো গাওয়া ঘি—যাতে ভয়ানক দুর্গন্ধ, সেই সঙ্গে সর্ষের তেলে খোসা সমেত মাষ কলাই ফুটিয়ে সেই তেল গরম গরম মালিশ করতেন আমার বুকে-পিঠে। আর পাঁচন তো ছিলই।

'পার্লে'-এর লাল লাল সাগু বা সাবু দুধ চিনি দিয়ে খেতে হত। সেটা বেশ বড়লোকি ব্যাপার ছিল। শাদা রঙের সাবু বা সাগুও ছিল। সাগু বা সাবু দুধ দিয়ে খেতে নেহাত খারাপ লাগে না। কিন্তু বার্লি? 'লিলি' বার্লি—যার (ছোটো টিনের) ওপর পদ্ম ফুলের ছবি, তখন ছোটো বড় নানান সাইজের ডিবেতে পাওয়া যায়, সেই সঙ্গে 'পিউরিটি ইন্ডিয়ান' বার্লি হলুদ রঙের কৌটোর ওপর যদ্দুর মনে পড়ে মেমসাহেব আর সাহেবের টান টান মুখ। পাশাপাশি 'রবিনসন বার্লি'। 'পিউরিটি ইন্ডিয়ান' বার্লি, 'রবিনসন' বার্লি একটু খাস আদমিদের জন্য। আমজনতা—পাবলিকের জন্য লিলি বার্লি। মাথাধরলে তখন 'অ্যানাসিন' ট্যাবলেট। তারপর এল 'সারিডন', 'অ্যাসপ্রো', 'অ্যাসপিরিন'। খবরের কাগজে এদের বিজ্ঞাপন হত। পরে রেডিওতেও।

জ্বর হলে ঠাকুর বাড়ি পুজো দেবেন বলে মা তামার চাদরে তৈরি পেটা কলসি, নয়ত ঢালাই করে বানানো কলসির ভেতর আমার মাথায় ছোঁয়ান ডবল পয়সা রাখতেন। পরে চার আনা।

দুর্গাপুজোর আগে আগে জ্বর সেরে গেলে মুখ তো হাকুচ তেতো। বিস্বাদ। তার সঙ্গে নুন-লেবু-বার্লি। নয়ত দুধ-বার্লি। উফ, কি যে খোয়াব সে সব খেতে গিয়ে। ওক তুলে বমি করে যাই আর কি। পরে কেমন যেন আস্তে আস্তে ভালো লেগে গেল পাতি লেবু রস চিপে নুন দেওয়া ঠান্ডা বার্লি। লেবুর রস না মেশালে বার্লিতে কেমন যেন সাবান জলের গন্ধ পেতাম।

জ্বরের পর অন্নপথ্যি করা তখন একটা ব্যাপার। বিশেষ করে পয়সাওলা বাড়িতে। ভালো, কেঁদো মাগুর, নয়ত শিং মাছ, আলু ছাড়া, শুধু কাঁচকলা পেঁপে দিয়ে, আদা বাটা, গোলমরিচ, জিরে বাটা দিয়ে হালকা ঝোল। ফরিদপুরের কোনো কোনো পাশ্চাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণ পরিবার শিং মাছ খেতেন না। তাঁরা মনে করতেন শিং মাছ আসলে ব্রাহ্মণ। তার গলায়—মুন্ডুর নিচে নাকি পৈতে—উপবীত চিহ্ন আছে। দেশ ভাগের পর এসবই অবশ্য ভেঙে চুরে দলা পাকিয়ে গেছে।

গারসি সংক্রান্তির ব্রতে শাপলা ফুল দিয়ে মূর্তি শূন্য জল চৌকি সাজান হত। শাপলা ডাঁটার তরকারি, কলাইয়ের ডাল, উড়ির চালের ভাত—এই হল ব্রতীদের খাদ্য। সেই সঙ্গে জলচৌকিতে রাখা থাকত কাঁচা তেঁতুলের ছড়া। মা বলতেন, সেই যে ধানীপানি গৃহস্থ বাড়ির কর্তা, স্ত্রী বিয়োগের পর তাঁর কাছে অলক্ষ্মী এল সুন্দরী মেয়ের রূপ ধরে। সন্ধ্যার পর মাঝ বয়েসি শ্বশুর একটু দূরে, জঙ্গলের ধারে পায়খানায় গেলে সেইখানে অলক্ষ্মী আসে। একদিন যায়। দুদিন যায়। তিন দিন যায়। তারপর একদিন সেই শ্বশুর অলক্ষ্মীকে বিয়ে করতে চায়।

অলক্ষ্মী বলে, বেশ তোমায় বিয়ে করব কিন্তু এক শর্তে। শ্বশুর জানতে চায় কী সে শর্ত?

**অলক্ষ্মী** - তোমার ছেলের বৌরা গারসি সংক্রান্তির দিন লক্ষ্মী-অলক্ষ্মীর ব্রত করতে পারবে না। নিরামিষ খাওয়া চলবে না। আমিষ খেতে হবে। উড়ির চালের ভাত, কলাইলের ডাল, শাপলার তরকারি—সব বাতিল।

**শ্বশুর** - বেশ, তা নয় হল। সবই হবে।

**অলক্ষ্মী** - এখানেই শেষ নয়। বৌরা সন্ধেবেলা রোজ যে শঙ্খধ্বনি করে, করতে পারবে না। সেই সঙ্গে সন্ধ্যাপ্রদীপ দেওয়াও বন্ধ করতে হবে।

**শ্বশুর** - বেশ, সবই তো হল আর! আর বাকি আছে?

**অলক্ষ্মী** - গারসি সংক্রান্তির দিন শালুক শাপলায় কামড় দেওয়া চলবে না।

**শ্বশুর** - বেশ, তাই হবে। এবার তুমি আমারে বিয়া করবা তো!

**অলক্ষ্মী** - হ, করুম।

শ্বশুর বাড়িতে ফিরে এসে তার সাত বৌমাকে ডেকে সব বলে, গারসি সংক্রান্তির দিন সে যে বৌমাদের জন্য 'নতুন শাশুড়ি-মা', ছেলেদের জন্য 'নতুন-মা' আনতে যাচ্ছে, সে কথাও জানিয়ে দেয়।

বৌমারা রাজি হয় শ্বশুরের শর্তে। তারা জানিয়ে দেয়—গারসি ব্রত করবে না। ব্রত শেষে শালুক-শাপলায় কামড় দিয়ে তিন বার থু-থু-থু করে ফেলবে না। উড়ির চালের ভাত, কলাইয়ের ডাল খাবে না।

সব শুনে শ্বশুর তো একেবারে আহ্লাদে বত্রিশখানা।

তারপর তো আশ্বিনের সংক্রান্তি আসে। সাত বৌ লুকিয়ে লুকিয়ে—অতি গোপনে উপোস থেকে স্নান সেরে গারসি ব্রত সারে। বততো কথা শোনে। কথা শোনার পর তিন তিন বার শালুক-শাপলায় কামড় দিয়ে দিয়ে থু-থু-থু করে ফেলে।

এরপর উড়ির চালের ভাত, কলাইয়ের ডাল দিয়ে তাঁরা দুপুরের খাওয়া সারেন। মাছ, মাংস—সবই রান্না করে দেন শ্বশুরের পাতে।

সন্ধ্যাবেলা সেই শ্বশুর তো সেজেগুজে পায়খানার পাশে অলক্ষ্মীকে বিয়া করতে যায়।

ওমা, বিয়ে করবে কি! সেখানে পৌঁছে তো শ্বশুরের দু চোখ একেবারে চড়ক গাছে।

কোথায় সেই সুন্দরী, ছলাকলাময়ী, মোহিনী! তার বদলে ভয়ানক দর্শন এক বি-ই-শা-ল কাক, সন্ধ্যার অন্ধকারে এক পা স্বর্গে আর এক পা মর্তে দিয়ে ভয়ানক দুই কালো ঠোঁট ফাঁক করে চিৎকার করছে ভয়াল কণ্ঠে—

*তর (তোর) বৌ উড়ির চাল কলুইয়ের ডাল*
*খাইছে রে খাইছে*
*তর (তোর) বৌ শালু-শাপলায় কামড়*
*দিছে রে দিছে*
*তর (তোর) বৌ সন্ধ্যা প্রদীপ*
*দিছে রে দিছে...*

ব্যস।

ভয়ানক এক দৃশ্য দেখে শ্বশুরের তো আত্মারাম একেবারে খাঁচা ছাড়া। শ্বশুর তো গোঁ-গোঁ-গোঁ করতে করতে অজ্ঞান।

বৌদের কথা শুনে শ্বশুরের ছেলেরা একটু দূরত্ব রেখে পেছন পেছন আসছিল তাদের বাবার। তারা তো এই বীভৎস দৃশ্য দেখে নিজেরাই প্রায় ভিরমি খাওয়ার জোগাড়। তাড়াতাড়ি তারা বাবাকে তুলে এনে জলটল দিয়ে সুস্থ করে। সেই কাকরূপী অলক্ষ্মী তো ততক্ষণে পগার পার।

ব্রতকথা শেষ করে শাপলা ডাঁটা আর শাপলার গোড়া শালুকে কামড় দিতেন মা। থু-থু-থু করে তিনবার মাটিতে ফেলতেন। সেই সঙ্গে অন্য অন্য ব্রতীরা, আমরাও।

বালির বাবুর পুকুরের জলে ছিল শাপলা ডাঁটা। শাপলা ফুল ফুটত। সেই শাপলা ডাঁটা ফুল, অনেকটা গভীরে ডুবে, জলতলের বেশ নিচে গিয়ে তুলে আনতাম শাপলার গোড়া, কালচে সবুজ শিকড়—শালুক।

এর অনেক অনেক পরে দুটো চিকুলি শিখেছিলাম, তাও এই শালুক-শাপলা সংক্রান্তই, তা হল—

ক) *শালুক চিনেছে গোপাল ঠাকুর*

খ) *শালুক খেয়ে দাঁত কালো*
*লোকে বলে আছে ভালো*

গভীর জলের তলা থেকে ডুবে ডুবে হাতে করে পাঁক তুলে আনা তখন মফস্‌সল শহরে এক অতি বীরত্ব ব্যঞ্জক খেলা। পুকুরের পাঁকেই তো লুকনো থাকে শালুক—শাপলার গোড়া। তখনও স্বাধীন বাংলাদেশ, শাপলার তার জাতীয় ফুল হয়ে ওঠা নেহাতই ভবিষ্যতের গর্ভে। সাদা রঙের শাপলা ফুলের পাশাপাশি লালচে শাপলা দেখেছি ঘাটশিলায়, এই শরতেই—সুবর্ণরেখায় চান করতে যাওয়ার পথে ডোবার ভেতর।

পুজোর আগে আগে কুমোর পাড়ায়, বিভিন্ন বড় বাড়ির ঠাকুর দালানে বসে, দাঁড়িয়ে ঠাকুরের কাঠামো বাঁধা, এক মেটে, দো মেটে, সাদা রং চাপানো দেখেছি মন দিয়ে তার অনেক পরে চক্ষুদান। ক্লাস সিক্স, সেভেনে পড়ার সময় খুব ঝোঁক চেপে ছিল ঠাকুর গড়ানোর, কালী, সরস্বতী। বীণা, হাঁস—এসব খুবই ভালো হত সরস্বতীর। মুখ গড়তে পারতাম না। কালী ঠাকুরের বেলাতেও তাই। ঝাঁটার কাঠি দিয়ে হাত, মুন্ডু—সব ঠিকঠাক সেট করতাম। কালী প্রতিমা তৈরি করলে মা রাগ করতেন। বলতেন, ঠাকুর গড়লে পুজো করতে হয়। আমাদের সে সামর্থ্য কোথায়! তাছাড়া কালী ঠাকুর 'কাঁচা খেগো দেবতা'। ওনিয়ে ছেলেখেলা করতে নেই। সরস্বতী বানিয়েছ ঠিক আছে, কালী নয়।

ভয় পেতাম না। বরং দেবতাকে ঘিরে তৈরি করা রহস্যময়তা নেচে বেড়াত মাথার ভেতর। দুর্গার ছবিওলা পুরনো ক্যালেন্ডার থেকে ভালো করে ছবিটি কেটে পিস বোর্ডের ওপর ময়দার আঠা দিয়ে মেরে তারপর দশ টাকায় কেনা বাবার ছ কোনাটি টেবলের নিচে দুর্গার প্যান্ডেল রঙিন কাগজ দিয়ে। টেবল ল্যাম্প এনে তা দিয়ে দেবী মুখে ফোকাস। ইলেকট্রিক লাইন নিজে হাতে করতে গিয়ে বাঁ হাতে এসির ঝনন ঝনন ইলেকট্রিক শক। সেই কারেন্ট খেয়ে কী করে যে বাঁচলাম, এখনও ভাবি। এসি টেনে ধরে রাখে, ডিসি ধাক্কা দিয়ে ছিটকে ফেলে দেয়, এমন একটা কথা জানতাম। জায়গা মতো সেসব তো কিছুই মিলল না। তড়িদাহত হলাম। কিন্তু পুজো থামালাম না। 'কলির অশ্বমেধ' দুর্গাপুজোর জন্য ছোটো তামার ঘট—যা কিনা কাশী থেকে আনানো, তার ওপর বাড়ির নারকেল গাছ থেকে খসে পড়া ভাবের কুসি। নিজেই পুজো করি। নিজেই প্রসাদ খাই। মাঝে বাবা একদিন চণ্ডীপাঠ করে দিলেন 'শুদ্ধ বস্ত্র' পরে, শুদ্ধাচারে। তবে প্রসাদ বলতে সেই দানাদার, গুজিয়া, নকুলদানা, বাতাসাই।

মাটির মোষ তৈরি করে বলিদান পর্ব হল অষ্টমী নবমীর সন্ধিক্ষণে। তার রক্ত বোঝাতে মায়ের আলতার শিশিও হাপিস। বালির বাড়ির উঠোনে সাজান গোলাপি দোপাটি, নীল অপরাজিতারা লাগল পুজোয়। তখন নেহাতই সেভেন কি এইট বড় জোর। ভাবতাম বড় হয়ে, অনেক অনেক টাকা রোজগার করে দুর্গোৎসব করব। সে স্বপ্ন নেহাতই স্বপন মেঘ হয়েই থেকে গেছে। দুর্গাপুজো বা দুর্গোৎসব আর করা হয়নি। বাঙালি কল্পনায় তৈরি হওয়া তার ছেলেমেয়েদের পুজো করেই দিন কেটেছে।

যখনকার কথা বলছি, সেই ষাটের দশকে একটা পাতিলেবু তিন নয়া পয়সা, লুজ বার্লিও মুদির দোকান থেকে দু পয়সা—মানে তিন নয়ার কেনা যায়। সাবু বা সাগুও তাই। আশ্বিনের জ্বর গা থেকে ছেড়ে যেতে যেতে তিন থেকে সাতদিন। কিন্তু শরীর তো খুবই কাহিল। মা বাটি ভরে মসুর ডাল খেতে দিতেন। গরিবের প্রোটিন। মসুর ডাল পাঁচ সিকে, দেড় টাকা কিলো বড় জোর। এটাও ষাট দশকেরই হিসেব।

দুর্গাপুজোর আগে আগে—মানে পুজো লাগোয়া সময়ে 'বাটা' কোম্পানি 'বাটা' ছাপ মারা শক্তপোক্ত বেলুন দিত জুতো কিনলেই। তখন বেলুনওলার কাছে বড় বেলুন চার আনা—পঁচিশ নয়া পয়সা, আরও বড় ছ আনা—সাঁইত্রিশ নয়া পয়সা। অতি বড় আট আনা—পঞ্চাশ নয়া পয়সা। সেই বেলুনের গায়ে দিলীপ কুমার, রাজেন্দ্র কুমার, রাজ কাপুর, নার্গিস, মীনাকুমারীদের মুখ। কখনও বৈজয়ন্তীমালা। সেটাও ষাট দশক। সবে তখন বাটা কোম্পানির 'পুজোয় চাই নতুন জুতো' স্লোগান চালু হয়েছে। পরে জেনেছি বিশিষ্ট শিল্পী পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায়, যিনি পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের পুত্র—'দুলুদা' নামেই বেশি পরিচিত, 'বাটা'র আর্ট ডিরেক্টর।

পুজোর চারদিন বাড়িতে একটু অন্যরকম খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করতে চাইতেন মা। মানে একটু লুচি-পরোটা, তা হবে লক্ষ্মী ঘিয়ে, সেই সঙ্গে একদিন খাসির মাংস। বিজয়ায় পুঁটি মাছ, দইয়ের বুঝ মানে অতি সামান্য পরিমান মিষ্টি দধি তো আছেই। জোড়া ইলিশের পব্বো ছিল আমাদের ঢাকার বাড়িতে। দেশ থেকে—পূর্ববঙ্গ থেকে উৎখাত হয়ে আসার পর বাবা আর জোড়া ইলিশের পথে যান নি, মানে যেতে পারেন নি। অনেক বাড়িতেই দুর্গা দশমীতে জোড়া ইলিশ। তার গায়ে, মাথায় তেল-সিঁদুর হলুদের ছোঁয়া। শাঁখ বাজিয়ে বরণ করে তোলা হয় তাকে। তারপর আবার সরস্বতী পুজোর দিন—দু দুটো আস্ত ইলিশ। মাঝখানে আর 'হিলশা'—বাঙাল জিভে যা 'ইলশা' খাওয়া নেই। তখনও কলকাতার গঙ্গায় বাগ বাজার ঘাটে টাটকা ইলিশ। বালিতে গঙ্গার বুকে ইলিশের নৌকো দেখা যায়। চুঁচড়ো, বালি—সর্বত্রই সদ্য ধরা টাটকা ইলিশ খেলে, গঙ্গার ইলিশ। সেটা ষাটের দশক। দশ, বারো, পনেরো টাকা সের— মানে কিলো ইলিশ। খাসির মাংস আড়াই টাকা। 'চিল্কার ইলিশ' নামে একটা হদকুচ্ছিত ইলিশ আসে বাজারে, ওড়িশা থেকে, দামে সস্তা। যেমন বিশ্রী দেখতে, তেমন বিচ্ছিরি তার স্বাদ। কেমন যেন একটু আঁশটানি গন্ধও থাকত। দামেও বেশ সস্তা প্রায় স্বাদ বিহীন সেই ইলিশ।

দুর্গাপুজো এলেই এইসব সাত-সতেরো, উনিশ-বিশ মনে পড়ে।

বাবা বলতেন কাশীতে অন্নপূর্ণার বাড়ি অন্নকূট দেখলে নাকি অন্ন মানে ভাতের কষ্ট হয় না। বারাণসীর অন্নপূর্ণা-আলয়ে অন্নকূট উৎসব আজও আমার দেখা হয় নি। শুনেছি অন্নকূট উৎসবের সময় সোনার অন্নপূর্ণা নাকি দর্শক-ভক্তদের দর্শন দিতে বাইরে আসেন। কনক নির্মিত সেই অন্নপূর্ণা দর্শনের সাধ বাল্যে, কৈশোরে ছিল। মায়েরও ইচ্ছে ছিল বারাণসীতে থেকে অন্নকূট দেখার। হয় নি। জীবনে এমন কত কি হয় না। মায়ের অধিকাংশ ছোটো ছোটো চাওয়াই তো না পাওয়া থেকে গেছে অভাবের সংসারে। যে পরিবারে অনেক সময়ই নুন আনতে পান্তার আকাল হতে থাকে। একা হাতে দুর্গা, অন্নপূর্ণা হয়ে, মা কত সামলাবেন। তবু তাঁকে দেখেছি সব সময় গরিব, যার কেউ নেই এমন মানুষের পাশে দাঁড়াতে। তিনি বলতেন, যে কমজোরি, সেভাবে পেরে উঠছে না, সব সময় তার হাত ধরবে, অন্যায়ের প্রতিবাদ করবে।

রোজ ভাতের চাল নিতে গিয়ে এক মুঠো করে সরিয়ে রাখতেন মা। তখন অনেক বাড়িতেই এমন হত। বেস্পতিবার বেস্পতিবার কাশী থেকে দশ টাকায় কিনে আনা 'শুদ্ধ বস্ত্র লাল পাড়', 'ছালের কাপড়', আসলে সেটা হয়ত 'পাট সিল্ক' বা 'কাশীর সিল্ক'—পরে মা লক্ষ্মীর পাঁচালী পড়তেন। সেইসব লাইন কিছু কিছু মনে আছে—

'... রাখিবে তণ্ডুল তায় এক মুষ্টি করে...'

তারপরের লাইনে—

*'...সঞ্চয়ের পন্থা ইহা জানিবে সকলে*
*উলুধ্বনি কর সবে অতি কুতূহলে*
*আলস্য ত্যাজিয়া সূতা কাট বামাগণ*
*দেশের অবস্থা মনে করিয়া চিন্তন...'*

লক্ষ্মীর পাঁচালী শেষ হওয়ার পর তারকেশ্বরের পাঁচালী।

আমাদের বাড়ির দরজায় এসে কোনো ভিক্ষুক, মানিক পিরের মুশকিল আসান, মুখে কাঠি দেওয়া প্রায়শ্চিত্ত করতে চাওয়া—'গো-বধ' কীর্তন করা লোকজন, বাউল, কুষ্ঠ রোগী কেউই ফিরে যেত না। মা সবাইকে চাল, আলু, খুচরো পয়সা দিতেন। কখনও কখনও হয়ত বাবাকে একটু আড়াল করেই। মা বলতেন, ওদের আমার না দেখলে কে দেখবে! পুরী, কাশী, বৃন্দাবন, বৈদ্যনাথধাম, হরিদ্বার, যখনই আমরা কোথাও গেছি রেল চাকুরে বাবার সঙ্গে পাসে, তখন—সেখানে কাঙালিদের দেওয়ার জন্য মা চাল, খুচরো পয়সা—এক নয়া, দু নয়া পয়সা নিয়ে গেছেন।

বাবা খুব চাইতেন দুর্গাপুজোর কোনো একটা দিন—সপ্তমী থেকে নবমীর ভেতর, যদি বাবার ডিউটির সময় থেকে ম্যানেজ করে ঠাকুর দেখার সময় বার করা যায়, তাহলে হেঁটে হেঁটে আমাদের বালির বাড়ির চারপাশের বারোয়ারি তলার ঠাকুর—জোড়া অশ্বত্থতলা, যুবক সমিতি, পাঠক পাড়া, কৃষ্ণ কোট চ্যাটার্জি লেন, হরিসভা, ব্যানার্জিপাড়া, নিমতলার ঠাকুর দেখবেন। একটু দূরেই উত্তরপাড়া। সেখানে অনেক অনেক সর্বজনীন আরাধনা। সেই সঙ্গে বাড়ির পুজোও আছে দু-একখানা। সব ঘুরে ঘুরে দেখবেন। মা-ও হয়ত কাচা, পুরনো শাড়ি টাড়ি পরেই তৈরি হলেন। তখন কী যে সুন্দর লাগত মা-কে।

কথায় কথায় জেনেছিলাম মায়ের জন্ম নাকি ভাদ্র মাসে। বাবার জন্ম শ্রাবণে। মা আবার কখনও কখনও বলতেন, তাঁর জন্ম বৈশাখেও হতে পারে। কোনটা সঠিক জানি না। তখনকার দিনে কে আর 'মাইয়া সন্তানের' জন্মদিন, জন্ম মাসের হিসেব রাখে! সে তো প্রায় একাশি-বিরাশি বছর আগের কথা। কিন্তু বৈশাখ বা ভাদ্র যে মাসেই তাঁর জন্ম হোক না কেন, এই দু মাসেই রবি অত্যন্ত প্রখর। মায়ের আত্মসম্মান জ্ঞান সেই অতি প্রখর রবিকেই মনে করাত।

দুর্গাপুজোর চারদিন মা পায়ে আলতা পরতেন। শচীনের তরল আলতা। ফর্সা পায়ের পাতায় সেই অলক্তরাগ কোনো কুসুম রেখা হয়েই ফুটে থাকত। সংসারের সব কাজ সেরে, আর একবার স্নানের পর মা আলতা পরতেন, কখনও বাঁ হাতের বুড়ো আঙুল দিয়ে একটানে। কখনও বা নতুন আলতার শিশির পাশে বাক্সর ভেতর রাখা স্পঞ্জের মাথাওলা ছোটো তুলি দিয়ে। তুলির সঙ্গে আলতা ঢালার টিনের ছোটো বাটিও থাকত। সেটি রুপো রঙের।

একাদশী, সপ্তাহের ফি বেস্পতিবার, পূর্ণিমায় তিনি আলতা পরতেন, যদি না কোনো শারীরিক প্রতিবন্ধকতা থাকত। প্রতি বেস্পতিবার তাঁকে আলতা পরাতে আসতেন 'ছোটো কাকিমা'। তিনি বালি গোস্বামীপাড়া, শান্তিরাম রাস্তা, এপাশে ওপাশে—সর্বত্র ছোটো কাকিমাই। তাঁর স্বামী ছিলেন ক্ষৌরকার। দুই ছেলে হাবি, সুনীল, দুজনেই সেই পেশাতে। পরে বোধহয় সুনীল বৃত্তি বদল করে।

ছোটো কাকিমা—মানে নাপিতবাড়ি বানরসুন্দর বাড়ির ছোটো বৌ বাড়ি বাড়ি ঘুরে যজমান রাখতেন। তাঁর আলতামাখা বটুয়ার ভেতর আলতার শিশি, বাটি, পায়ের কড়া, গুঁপো, বেড়ে ওঠা মাস কাটার নরুন, ন্যাকড়া। ওঁর আর এক জা সেজো কাকিমা—তিনিও আলতা পরাতেন। ১৯৬৩-৬৪ সালে দশ নয়া পয়সা পেতেন ওঁরা আলতা পরিয়ে। পুরনো হিসেব—চোষট্টি পয়সায় একটা গোটা টাকা, এমন পাটিগণিতের অঙ্কের দশ নয়া পয়সা দু আনার থেকে দু নয়া পয়সা কম। বারো নয়া পয়সায় দু আনা হয়। পঁচিশ নয়া পয়সায় সিকি। পঞ্চাশ নয়া পয়সাতে আধুলি। একশো নয়া পয়সায় গোটা একটা টাকা।

সেই আলতা পরানোর পারিশ্রমিক পরে, কালে দিনে বেড়ে পঁচিশ নয়া পয়সা হল। আলতা পরাতে এসে ছোটো কাকিমা অনেক অনেক গল্প করতেন মায়ের সঙ্গে। চা খেতেন। সঙ্গে বিস্কুট। পুজোর দিনে মা তাঁকেও দশ বিশ নয়া পয়সা বেশি দিতেন। এত অভাবের সংসার, এত টানাটানি, ঠেলাঠেলি, তবু যে কী করে পারতেন জানি না। ভাবলে বিস্ময় লাগে। তার মধ্যেই পুজোর চাঁদা, বাড়তি খরচ, বিজয়ার মিষ্টি মুখ নাড়ু, তক্তি, কোজাগরী লক্ষ্মীপুজো, আসো জন বসো জন।

কী করে পারতেন তিনি? কেমন করে পারতেন, খুব জানতে ইচ্ছে করে। যখন চারপাশে কেবল অভাব আর অভাব, ক্রমাগত দেহাই দেহাই—দাও, দাও—আরও দাও—কেবল আমাকেই দাও, দিতে থাক—রব। তখন আমাদের গর্ভধারিণী দ্বিভুজা হয়েও যিনি দশভুজা ছিলেন, তাঁর কথা মনে পড়ে। চোখ ভিজে আসে স্মৃতিভারে। এখনও তিনি দশভুজা হয়েই সব সময় আমাকে আগলে আগলে রাখেন। ঘন বিষাদ মুহূর্তে, মন খারাপের চরম সীমায় যখন পৌঁছে যাই, তখন হাত রাখেন পিঠে। বলেন, ওতো একটু হবেই বাবা। সংসারে ওসব হয়। হেরে গেলে চলবে! আমাদের তো রাই কুড়িয়ে বেল, বুঝে চলতে হবে না।

বুঝতে পারি আমার দশ ভুজার নিরঞ্জন হয় না। হবে না।

# একজন পুরুষের অভিব্যক্তি প্রকাশ

অসিত মজুমদার

দাম্পত্য জীবনে রক্তিম হৃদয়ে তোমাকে পেয়েছিলাম, আকুল আগ্রহে আমারই মনের মণিকোঠায়। দীর্ঘ পথ অতিক্রম করতে করতে বেশ কয়েক বছর পেরিয়ে এলাম। নানাবিধ সমস্যা ঝড় ঝটিকা, দুঃখ যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে অতিক্রান্ত হয়েছে এই দুর্গম পথ। অবশেষে এসে দাঁড়িয়েছি এক নিঃসঙ্গ পর্বতমালার বিপদজনক খাদের কিনারায়। সেখান থেকে বেরিয়ে এসে নতুন করে বাঁচার স্বপ্ন হৃদয় থেকে মুছে যাওয়ার উপক্রম। আর হৃদয়ের মধ্যে বাঁচার সদিচ্ছা থাকলেও নিষ্ঠুর প্রকৃতিও যেন বিরোধিতা করছে। তাই আকারে জীবিত থাকলেও ভিতরে মৃতপ্রায়। মৃতপ্রাণ অবস্থায় ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেও কোনো ভালো ফল হয়নি, কারণ ভগবানকে আমরা তখনই স্মরণ করি, যখন আমরা বিপদে পড়ি।

ভগবান এমনই একটি বস্তু যাকে দেখা যায়, ছোঁয়া যায় না, অনুভূতির জগতে তাকে কল্পনার দ্বারা কিছুটা অনুভব করা যায়। অনুভূতি বড় স্পর্শকাতর সকলের মধ্যে তাই জাগরিত হওয়াও কঠিন। আর একটা কথা বলাই বাহুল্য যে সমাজে আমাদের মতো স্বার্থপর মানুষের সংখ্যাই বেশি। আর স্বার্থপর মানুষের কোনো অনুভূতি থাকে না। তাই তারা নিজের স্বার্থে বড় কোনো বিপদে পড়লে ভগবানকে স্মরণ করে। কিন্তু এটা জানে না যে ভগবান কখনও কোনো স্বার্থপর লোভী মানুষের ডাকে সাড়া দেন না। ধর্মের প্রতি ভীরু কাপুরুষ ব্যক্তিত্বকে ভগবান কখনোই তাঁর বুকে স্থান দেন না। দুর্বল ব্যক্তিত্বকে তিনি ঘৃণা করেন। পরমাত্মার প্রতিবিশ্বাসী দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ব্যক্তিত্বকে তিনি তাঁর বুকে স্থান বা ঠাই দিয়ে থাকেন। আর সেখানেই আমাদের ব্যর্থতা।

ব্যর্থতার গ্লানি তাই এই ব্যক্তিত্বকে সর্বদা-সর্বাগ্রে তাড়া করে নিয়ে বেড়ায়, পৃথিবী তথা সমাজের একপ্রান্ত থেকে অপরপ্রান্তে কোথাও তাদের সুযোগ্য পরিবেশ মেলে না। নতুন দিগন্তের সন্ধানে মরিয়া হয়েও কোনো পথ আবিষ্কার করার প্রেক্ষাপট তৈরি করতে এরা নারাজ। সত্যিকথা বলতে, এরা ভাষাহীন, বাক্যহীন হয়ে পড়ে। এরা কোথাও কাউকে পুঙ্খানুপুঙ্খ-চুলচেরা বিশ্লেষণে বোঝানোর ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে, এখানেই তাদের ব্যর্থতা।

সংসার, পরিবার, পরিজন আত্মীয় সকলের প্রতি দায়িত্ব পালন করা সত্ত্বেও এরা উপেক্ষিত সমাজের ময়ূর ছাড়া কার্তিকের ভূমিকা পালনে সমর্থিত হয়। আকুল নিষ্ঠা থাকা সত্ত্বেও স্ত্রী, পুত্র, কন্যা কেউই ভালো চোখে তাদের গ্রহণ করতে পারে না। পরিবারের প্রতিটি সদস্য নিজ নিজ স্বার্থ সিদ্ধি করার জন্য মিষ্টি ব্যবহার এবং অপরের নিন্দা করে নিজের জায়গায় বা সিদ্ধান্তে অনড় থেকে কাজ করে, পরক্ষণেই জঘন্য ব্যবহারে সামিল হয়।

'মা'-বাবার সঙ্গে যে আচার ব্যবহার, ক্রিয়াকলাপ করে থাকেন ঠিক তাঁর কন্যা ঐ অনুকরণ করতে বিন্দুমাত্র পিছু পা হয় না। আর সেই কন্যা কিছুদিন পরে যখন স্বামীর ঘরে যায় তখন সেও মা-এর মত অনুকরণ করে স্বামীর কাছে নিজেকে প্রমাণ করার চেষ্টা করে, স্বামী প্রতিবাদ করলে, সংসারে একটা ভুল বোঝাবুঝির সীমানা তৈরি হয়। আর এই ধরনের ক্রিয়া পরপর বেশ কয়েকটি Generation এও পরিবর্তন হয় না। সমাজে চলতে থাকে চরম এক অশান্তি। এই অশান্তি যুগযুগান্তর ধরে চলে। মনুষ্য জীবনকে বিলুপ্তির পথে নিয়ে যায়। আর এর জন্য বিশেষ দায়ী করা যায় পরিবারের 'মা' কে। এইরকম মায়ের সংখ্যা সমাজে অনেক বেশি। যাঁরা ব্যতিক্রমী 'মা' তাঁরা ঠিক তার উল্টো, তাঁরা সমাজের উচ্চ স্থান পান।

উদাহরণ হিসাবে 'মা সারদা' ও 'জগৎমাতা'-এর নাম স্মরণ করা যেতে পারে।

মায়ের চরিত্রের গুণগতমান প্রভাব ফেলে তাঁর সন্তানের উপর। আর 'মা' তাই খুব আশাবাদী যে, তাঁর সন্তান যেন তাঁরই মতো চরিত্রের স্বভাবসিদ্ধ পরিকাঠামো গড়ে তোলে, এবং তিনি নিজেকে পবিত্র বলে দাবি করেন। কিন্তু সত্যি কি তাই হয়? বা হয়ে থাকে? বলাই বাহুল্য বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তাই-ই হয়। মায়ের গুণ বেশির ভাগটাই সন্তানের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়। বিজ্ঞানের পরিভাষায় বলা যায় বংশানুক্রমিক ধারায় প্রবহিত (Heridity)। কিন্তু Heridity Change ও হয়ে থাকে। আদর্শগত দিক থেকে বংশগতির এই পরিবর্তন সাধিত হয় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নারী চরিত্রের রক্ত থেকে।

শতকরা ভাগের বিচারে সন্তানসন্ততির মধ্যে মায়ের গুণাবলী বেশি প্রাধান্য পেয়ে থাকে। অতএব একটা পরিবার সুন্দর সাবলীল করে গড়ার বা তোলার ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা পালন করে থাকে—সেই পরিবারের 'মা'। কোনো পরিবারের 'মা'-এর উপর নির্ভর করে যে, সেই পরিবারের সন্তানেরা কেমন মানুষ হবে, এবং কতটা কর্তব্য-আদর্শ-নিষ্ঠা তাদের মধ্যে পরিলক্ষিত হবে। পরিবারের সকল নিয়মকানুন কৃষ্টি কালচার তৈরি হয়, পরিবারে অধিষ্ঠিত একজন 'মা'-এর

থেকে। বাবার ভূমিকা সেখানে যৎসামান্য। যদিও 'মা' বাবার কথোপকথনে আচার ব্যবহার রীতিনীতি সব প্রভাব ফেলে তার সন্তানদের উপর। কারণ সন্তান যা কিছু শিক্ষা গ্রহণ করে প্রথম তাঁর 'মা' 'বাবা' পরিবারের মধ্যে থেকে। মাতৃজঠর থেকেই শিশুর শিক্ষা শুরু হয়। শিক্ষা বিজ্ঞানের (Education) থেকেই উপরোক্ত বাক্যটি নেওয়া হয়েছে। পরিবারের মধ্যেই তার প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা থেকে প্রাথমিক শিক্ষার পদার্পণ করা পর্যন্ত সবধরনের শিক্ষাই শিশু তাঁর 'মা'-'বাবা' এবং পারিপার্শ্বিক পরিবেশ থেকে শিখে থাকে।

অতএব বাবা এবং মায়ের ব্যর্থতা যে, তাঁরা যখন নিজেই মাতৃজঠর থেকে এই পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হয়েছেন তখন তাঁর মধ্যে প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা এবং প্রাথমিক শিক্ষার প্রকৃত বিকাশ ঘটেনি। পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে বা মানিয়ে নিয়ে ভালোভাবে মানুষ হতে পারিনি। এই ঘাটতি এঁদের মধ্যে বিশেষ প্রভাব ফেলে। তাই আমরা প্রত্যেকে আমাদের পরিবারকে সুন্দরভাবে গড়ে তুলতে পারছি না। আমরা তথা আমাদের পরিবারের সকলের মধ্যে ত্যাগের অংশ খুবই কম। পৃথিবীতে তাঁরাই তত বড় বলে নিজেকে জাহির করতে পারে—যাঁরা যত বেশি ত্যাগী এবং নিজেকে লুকিয়ে রাখতে পারে। কিন্তু আমাদের মধ্যে সেই জিনিসটা লক্ষ্য করা যায়—যে জিনিসটা হল হুমকি, ঝগড়া, চেঁচামেচি, পরিবারের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখি যেটা নাকি পরিবারের 'সন্তানে'র অমঙ্গলে'র কারণ এবং অশিক্ষার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

পরিবারের 'মা'কে ভালো শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়া যেমন দরকার তেমনি দরকার ভালো মানুষ হওয়া। উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হলেই শুধু ভালো মানুষ হওয়া যায় না। ভালো মানুষ হতে গেলে ভালো মনও হওয়া দরকার। আর ভালো মনের পিছনে দরকার ত্যাগের। কার্পণ্যতা নিয়ে কোনো মানুষ ভালো মনের মানুষ রূপে খ্যাত হতে পারে না।

একটা কথায় আছে সংসার সুখের হয় রমণীর গুণে। তাই ওঁদের মধ্যে ভেজাল থাকলে সংসারে অসুখের বাসা বাঁধে। সংসার সমগুণে বাধিত হয়, যখন সংসারে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে একটা অগাধ ভালোবাসার এক পবিত্র বাঁধন থাকে। সেই সংখ্যাটি এখন প্রায় সংসারে কমে গেছে। আর এক্ষেত্রে মেয়েদেরই বেশি দায়ী করব। কারণ মেয়েদের মধ্যে ক্ষমা জ্ঞান অত্যন্ত কম থাকে। ওরা অন্যের ভুল ধরতে অভ্যস্ত, নিজের ভুল খুঁজতে নারাজ। ব্যতিক্রমীদের জন্য কথাটি প্রযোজ্য নয়।

একজন 'মা' তাঁর সংসারকে মহিরুহে সাজাতে পারে যদি তাঁর চিন্তাভাবনার মধ্যে কোনোরূপ জটিলতা না থাকে। স্বচ্ছ চিন্তাভাবনা পরিষ্কার মন দিয়ে যদি সংসারের প্রতিটি জিনিস খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে 'ভালো' চিন্তা ধারার মালায় গাঁথে তবে একটা সুন্দর পরিবার গড়ে ওঠে। পরবর্তীতে সন্তান সন্ততির মধ্যেও সেই পরিচ্ছন্ন পরিবার তথা সমাজে গড়ার ভাবমূর্তি তৈরি হয় এবং হাতছানি দেয়। আসুন আমরা সকলে বদ্ধপরিকর ইহসুন্দর এবং সাবলীল পরিবেশ তথা সমাজ গড়ে তুলি। যেখানে থাকবে না কোনো বাধা কোনো বিপত্তি যেখানে থাকবে শুধুমাত্র মন্ত্র মুগ্ধ উচ্চারণ, যে উচ্চারণের মধ্যে কোনো জড়তা থাকবে না, থাকবে শুধু স্পষ্ট মনের পরিভাষা যে পরিভাষা একটা আদর্শ সমাজ এবং পরিবার গড়তে 'মায়েদের' ভূমিকায় এক নক্ষত্রখচিত দৃষ্টান্ত নজির বহন করবে।

# টাকী

## সুজিত সাধ্য

''ও নদী রে - একটি কথা শুধাই শুধু তোমারে।
বলো কোথায় তোমার দেশ
তোমার নেই কি চলার শেষ''।

অক্লান্ত ভাবে দুই দেশের মধ্যে দিয়ে বয়ে চলা নদী—ইছামতী। একপারে বাংলাদেশের সাতক্ষীরা ও অন্যপাড়ে ইন্ডিয়ার উত্তর ২৪ পরগণার টাকী। পশ্চিমবঙ্গের উত্তর ২৪ পরগণা জেলার সীমান্তবর্তী পুরোনো একটি শহর, নদীর দু-তীরেই গড়ে ওঠা জনবসতি। দু-পাড়ে ইন্ডিয়ার বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স (BSF) এবং বাংলাদেশের বাংলাদেশ রাইফেলস্ (BRD)-এর অতন্দ্র প্রহরা। আমরা দমদম পূর্বসিঁথি-ক্যাম্প-রাজরাজেশ্বরী রোড দুর্গোৎসব কমিটির সদস্য (১১) এগারোজন ২৫.০৮.২০১২ সকালে দমদম স্টেশন থেকে হাস্নাবাদ লোকালে করে প্রায় ১২:৩০ মি: নাগাদ টাকী স্টেশনে নামলাম। শিয়ালদা থেকে কমবেশি প্রায় দু ঘণ্টার রাস্তা, গাড়িতে দুটো আলাদা পথ ধরে যাওয়া যায়। একটি Science City-র উল্টো দিকে বানতলা হয়ে মালঞ্চর পরে বা দিকে পুর্তদপ্তরের ব্রিজ পার হয়ে সোজা টাকী, অন্যটা বারাসাত চাঁপাডালি মোড় থেকে ডানদিকে টাকীরোড ধরে সোজা। কমবেশি ৩/৪ ঘণ্টা লাগবে, তুনামূলক ভাবে মালঞ্চ হয়ে যাওয়াই সমিচিন।

যদিও আমাদের আগে বুকিং ছিল তৎসত্ত্বেও আমাদের স্থায়ী আবাস দেখে সবারই খুব পছন্দ হলো। আমরা ছিলাম টাকী মিউনিসিপালিটির গেস্টহাউসের তিন তলায়। চারকোণায় চারটে ঘর ও মধ্যেখানে আড্ডা মারার জন্য মার্বেল বাঁধানো একটা ছোটোখাটো ফুটবল মাঠ। T.V., Light, সোফা, নানারকম Wall-Picture দিয়ে সাজানো, ওখানে পৌঁছে একটু ফ্রেশ হয়ে দুপুরের খাবার Guest House-এ সেরে গেলাম ঠিক সামনেই নদীর পাড়ে ম্যাল অঞ্চলে। যদিও ম্যাল অঞ্চল মানে পাহাড়ের ওপর সমতল ভূমি তৎসত্ত্বেও আমার উল্লেখ করার কারণ হলো এখানেই সব টুরিস্টরা জমায়েত হয় এবং তারিয়ে তারিয়ে নদী ও আকাশ উপভোগ করে। টাকী মিউনিসিপালিটি খুব সুন্দর করে জায়গাটা সাজিয়েছে দেখলাম। পাশেই ওখানকার ''দিদি-জামাইয়ের'' ও অন্যান্য দোকানে নানারকম লোভনীয় খাবারের পসরা। হাঁটতে হাঁটতে ''আম্রপালী'' ও P.H.E-Guest House-এর দিকে এগোলাম। গন্তব্য লঞ্চঘাট, উদ্দেশ্য লঞ্চ করে ইছামতী ভ্রমণ। প্রায় ১:৩০/২:০০ ঘণ্টা ধরে টাকী মিউনিসিপালিটির সুসজ্জিত লঞ্চে করে মিনি সুন্দরবন, জিরোপয়েন্ট, মাছরাঙা দ্বীপ, ও দূরের হাস্‌নাবাদ শহর সব দেখা হলো। প্রচুর ওপারের বাংলাদেশি নাগরিক ও BDR দের হাত নাড়িয়ে অভিবাদন দেওয়া ও গ্রহণ হলো। লঞ্চের চালকই এক্ষেত্রে Guide-এর কাজ করলেন। এ প্রসঙ্গে টালিগঞ্জের সমমনোভাবাপন্ন একদল যুবকের কথা না বললেই নয়, সহযাত্রী হিসেবে তাদের পাওয়াতে ওই লঞ্চযাত্রা আরো সুখপ্রদ হয়েছিল। এছাড়াও জানলাম স্থানীয় কিছু ভ্যান রিকশাচালকের সৌজন্যে স্থানীয় দ্রষ্টব্য কিছু জায়গা দেখানোর ব্যবস্থা রয়েছে। ভ্যানরিকশা মিউনিসিপালিটির Guest House-এর সামনে থেকেই পাওয়া যাবে, উপরি পাওনা হিসাবে ভ্যানচালকদের Guide-এর ভূমিকা। এবেলা-ওবেলা করে দুইদিকের দ্রষ্টব্য জায়গাগুলি দেখে নিতে পারেন ৩৫/- টাকা মাথাপিছু হিসাবে। ডানদিকে পড়বে রাজবাড়ি, রামকৃষ্ণ আশ্রম, কলেজ, শ্মশান ইত্যাদি এবং বাঁদিকে নদী বরাবর রাস্তাধারে P.H.E.-Guest House, প্রাক্তন সেনাপ্রধান শঙ্কররায় চৌধুরির বাড়ি এবং মিনি সুন্দরবন। ভোরে ভোরে বেরোতে পারলে বেরোনোটা সত্যিই উপভোগ্য হবে। হেঁটে নদী বরাবরও বেড়ানো যায়। এ প্রসঙ্গে কোথায় উঠবেন, কীভাবে বুকিং করবেন জানিয়ে রাখি—মূলত নদী পাড়ে Lodge & Fooding এর জন্য আছে Taki-Municipality Guest-House. Taki-তে Phone (03217233328) করে Mr. Molay Mukherjee-র সঙ্গে কথা বলে Money Order/EFT বা ECS করে টাকা পাঠালেই হবে। Phone করবেন ১টার পর।

এছাড়া একদম নূতন "Amrapali Guest Houe" (Ph. No. 03217 234471, 9007063570 (M) Kankurgachi, Kolkata-তে ও Booking-এর ব্যবস্থা আছে। "Suhasini Guest House" (Ph. No. 03217 234108) এছাড়াও Citi Booking Kalindi 9339375915 (M) এবং Goal Park-2463-1230 (Ph.) W. B. Govt. PHE GUEST HOUSE – Apply–PA to MIC/PHE Public Health Department, 7th floor, New Secretariet Bldg. Kolkata-700001 সব Guest-House থেকেই নদীর View পাবেন। "Tisto Khonokal" (Taki Municipality Guest House) River-view পাবেন না। এছাড়া ও On-River গড়ে ওঠা টাকি-মিউনিসিপালিটির কিছু গেস্ট রুম, সমস্ত গেস্ট হাউসেই দেখবেন এখানকার বিখ্যাত বিজয়াদশমীর এপার বাংলা ও ওপার বাংলার মানুষের মিলনোৎসবের ছবি। প্রত্যেক গেস্ট হাউসে Dormetroy ও কন্‌ফারেন্স হল আছে। Week-end Tour হিসাবে যারা নতুন জায়গার সন্ধান করেন তারা এই weekend-এই সকাল সকাল বেড়িয়ে পড়ুন। টাকী আপনাদের অর্ভথনায় প্রস্তুত। বিজয়া দশমীর বুকিং-এর জন্য August-ই সঠিক সময়।

আমার মনে হয়েছে Hon. Minister–Ministry of Tourism, West Bengal যদি একটু নিম্নলিখিত বিষয়গুলির ব্যাপার দৃষ্টি দেন তাহলে অচিরেই এ জায়গাটি West Bengal এর অন্যতম Tourist-Spot হিসাবে নিজের জায়গা পাকা করে নেবে।

১. টুরিস্টদের নদীতে স্থানের ব্যবস্থা করে দেওয়া।

২. রাজবাড়ি দুর্গাদেউল ও অন্যান্য প্রাচীন বাড়িগুলি proper renovatation করে সামান্য fees-এর বিনিময়ে tourist দের কাছে দর্শনীয় হিসাবে তুলে ধরা—এতে স্থানীয় যুবক/যুবতীদেরও involve করা সম্ভব।

৩. অবস্থানগত ভাবে যেহেতু "Taki Nripendra" অতিথিশালা (Taki Municipality-র Main Guest House) সবচেয়ে ভালো জায়গায় সেহেতু Taki Municipality-র সঙ্গে মিলিতভাবে এর মান ভালো করা ও প্রচারের মাধ্যমে টুরিস্টদের কাছে একে তুলে ধরা। ভিতরের দিকে সুইমিং-পুল-এর ব্যবস্থা করা সম্ভব কিনা একটু দেখা।

৪. নদীবক্ষে স্পিড্‌বোট/বড় লঞ্চে টুরিস্টদের ওয়ান-ডে নদী ভ্রমণ করানো ও অন্যান্য আমোদপ্রমোদ ও খাবার দাবারের ব্যবস্থা করা।

# রূপকথার রূপকুন্ড

গৌতমাদিত্য ভট্টাচার্য্য

গাড়োয়াল-হিমালয়ের রূপকুন্ড দীর্ঘকাল ধরে তার রহস্যময়তার জন্য অভিযাত্রীদের নিরন্তর আকর্ষণ করেছে। তার দুর্গম অবস্থান, তার অনিশ্চিত আবহাওয়া; তার চারপাশে ছড়িয়ে থাকা নর করোটি ও অগ্নিরাশি দুরন্ত কৌতূহল সৃষ্টি করেছে পর্যটক মনে। বার বার তাই তারা ছুটে গেছে রূপকুন্ডের টানে। এমনই এক টানের কাহিনী এবারের ভ্রমণ বৃত্তান্ত। রোজনামচার আকারে তাই প্রকাশ করার চেষ্টা এখানে।

**১৭.০৮.২০১১ ঃ** বেলা ১-১৫টায় হাওড়া স্টেশনের ৮ নম্বর প্লাটফর্ম থেকে ছাড়লো ১২৩৬৯ আপ হাওড়া-হরিদ্বার কুম্ভ এক্সপ্রেস।

**১৮.৮.২০১১ ঃ** রাস্তায় সারারাত মেঘের গর্জন আর বৃষ্টি পাতের মধ্য দিয়ে সকাল হল লক্ষ্ণৌতে। রেলপথের দুই দিক জলপ্লাবিত বাতাসে সকালের ঠান্ডার সঙ্গে হালকা শীতের রেশ। বহু জায়গায় দেখা যাচ্ছে জনবসতি জলের তলায়। সামরিক বাহিনী চালিত রাবারের স্পীড বোট ও দেখা গেল এক এক জায়গায়।

একটু পরে, বেলা বাড়লে বৃষ্টি কমল। আরো কিছুক্ষণ গুমোট গরমের পর বিকেল ৫-৩০-এ যখন গাড়ি হরিদ্বার স্টেশনে ঢুকছে, তখন আবার আকাশ পরিস্কার হয়ে রোদ উঠেছে। হরিদ্বার স্টেশন চত্বরকে ডানদিকে রেখে কুম্ভমেলা উপলক্ষে তৈরি রেলের বর্ধিত প্লাট ফর্মের ঠিক বাইরে রাস্তার উল্টোদিকে 'গরিব দাসী' ধর্মশালায় একতলা ও তিনতলায় ঘর মিলল। রাত তিনটেয় থারালি যাবার বাস গাড়োয়াল মন্ডল বিকাশ নিগম বাস স্ট্যান্ড থেকে ছাড়ার কথা। তাই সন্ধ্যা হতে না হতেই হ্যাভার স্যাক খুলে বাড়তি মালের 'লেফ্‌ট লাগেজ' তৈরি হল, ফিরতি পথে তুলে নেওয়া হবে।

**১৯.৮.২০১১ ঃ** অ্যালার্মের শব্দে ঘুম ভাঙল রাত ১-৩০-এ বিদ্রোহী শরীর কে দমন করে মালপত্র নিয়ে রাস্তায়। বস্তা ভর্তি রসদসহ রিক্সার পিছু পিছু বাস স্ট্যান্ড। বাস ছাড়ল নির্ধারিত সময়ে ৩-টে তেই।

ঋষিকেশে যাত্রা বিরতি ঘটিয়ে ভোর ৪-৩০ মি. নাগাদ চা-বিস্কুট। আকাশ ফের মেঘলা। টিপ্ টিপ্ বৃষ্টি। আলো ক্রমে দ্বিধা জড়ানো পায়ে এগিয়ে আসছে, এমন সময় বাস থেমে গেল। শোনা গেল, সামনের রাস্তায় বিশাল ধ্বস নেমেছে। জায়গাটা দেবপ্রয়াগ থেকে ৮ কি.মি. দূরে। কাছে কোথাও কোন দোকান-পাট বা লোকালয়ের চিহ্ন দেখা যাচ্ছে না। দু-তিনটি বাস আগে দাঁড়িয়ে। কয়েকটা জীপ, মোটর সাইকেলে হেমকুন্ড যাত্রী গেরুয়া পাগড়ী ধারী শিখ যুবক, মধ্যবয়সী বৃদ্ধ।

সারাদিন অবর্ণনীয় কষ্টের মধ্যে কাটিয়ে বিকেল ৫টা নাগাদ শোনা গেল বাধা সরেছে। ঠিক হল আজ রাতে শ্রীনগর থেকে সকালের বাসে থারালি যাওয়া হবে। রাত আটটায় শ্রীনগর, গাড়োয়ালের প্রাচীন রাজধানী শহর। ওঠা হ'ল কালীকমলি ধর্মশালায়।

**২০.৮.২০১১ ঃ** ভোর চারটেয় তৈরি হয়ে পথে নামা হল। অনেক গড়িমসি করে বাস ছাড়লো। ঠিক হল এখন সোজা কর্ণপ্রয়াগ যাওয়া হবে। সেখান থেকে কোন বাস বা জিপে থারালি হয়ে ওয়ান্ যাব। কিন্তু কিছু দূর যাবার পরই আবার ধ্বস। এবার আরো বিশাল এবং তা সরানোর কোন ব্যবস্থাও চোখে পড়ল না। তবে কপাল ভাল, বেশি দূর যাওয়া হয়নি। তাই বাস শ্রীনগর ফিরল, এবার ওঠা হল G.M.V.N. এর ডরমিটরিতে। ঠিক হল কাল আবার চেষ্টা করা হবে এগিয়ে যাবার। পুলিশের কাছ থেকে আশ্বাস পাওয়া গেছে। আজ সন্ধ্যার মধ্যে না হলেও কাল সকালের মধ্যে বাধা সরে যেতে পারে। সে অবস্থায় সংশোধিত আকারে সংক্ষিপ্ত ভ্রমণ সূচি অনুসরণ করা হবে।

**২১.৮.২০১১ ঃ** কাল রাতে ঠিক হয়েছে পরদিন পৌড়ি ও ক্ষীরসু হয়ে প্রায় ৭ মি.মি বেশি ঘুর পথে দুর্ঘটনা স্থল এড়িয়ে National Highway ধরা হবে। গাড়ি আমাদের কর্ণপ্রয়াগ হয়ে থারালি পৌঁছে দেবে। সেখান থেকে 'লোহাজঙ্গ' পথে যাবার চেষ্টা করবো আমরা। তারপর সেখান থেকে 'পারমিট' করিয়ে 'ওয়ান্' গ্রাম। আগামী কাল ভোর ৪-টায় গাড়ী ছাড়বে। বিকেলে শ্রীনগরের কমলেশ্বর মহাদেব, শঙ্করমঠ ও অলকানন্দা নদীর ধারে এক অপরূপ পুরানো শিবমন্দির দেখে এলাম।

**২২.৮.২০১১ ঃ** কাল রাতে এক মিটিং-এ দল ঠিক করেছে যে এবার রূপকুন্ড পর্যন্ত গিয়ে অভিযানের ইতি টানা হবে। সময়ের অভাব এবং পথের দুর্গমতার কথা চিন্তা করে এবং গাইডের সঙ্গে কথা বলে ঠিক হয়েছে যে Ronty Saddle হয়ে মিলা সমুদ্র থেকে জিউনার গলিকল হয়ে ফের এই পথে ফিরে ট্রেন ধরা সম্ভব হবে না।

কথামতো সকাল ন'টায় যাত্রা শুরু হল। ১১-৩০ নাগাদ ওয়ান্ যাবার রাস্তায় 'কুলিঙ্গ' গ্রাম থেকে ডানদিকে নেমে নদী পেরিয়ে ফের চড়াই ভেঙে 'ভিঙ্না' গ্রামে পৌছান গেল বেলা ৪-৩০টার সময়। এবার ট্রেকার্স হার্ট-এ থাকার ব্যবস্থা হয়েছে। গ্রামের দু-তলা বাড়ি। কাঠের কাঠামোর ফাঁকে ইটের গাঁথুনি। মাথায় স্লেট পাথরের চাল। দোতলায় আমাদের থাকার ব্যবস্থা। নীচে রান্নাঘর ও ভাঁড়ার ঘর। এখানে আসার পর দ্রুত রোদ পড়ে আসছিল। চিকেনস্যুপ, চিঁড়ে ভাজা, চানাচুর সহযোগে টিফিন সারতে সারতেই ঘন করে কুয়াশা এগিয়ে এলো সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ় হবার আগেই রাতের খাওয়া সেরে sleeping bag-এর ভিতর সবাই আশ্রয় নিলাম।

**২৩.৮.২০১১ ঃ** সকাল ৬.৪৫-এ ধড়াচূড়ো পরে পথে নামা। প্রথম থেকেই বুক ফাটা চড়াই। পথে বেশিরভাগই জঙ্গলের মধ্য দিয়ে। বড় বড় গাছের ছায়ায় এমনিতেই সবুজ অন্ধকার, তার ওপর চারদিক ঘন কুয়াশার মত মেঘে ঢাকা। যত বেলা যাচ্ছে আকাশের চেহারা আরো খারাপ থেকে খারাপই হচ্ছে। পথে রাশিকৃত পচা পাতার স্তূপ, ভাঙ্গা ডালপালার ওপর দিয়ে যাওয়া। একদিকে গহন পাহাড়ি খাত, অন্যদিকে গাছের প্রাচীর। পথে এক জায়গায় রুটি তরকারী দিয়ে জলযোগ সারা হল। পথের দূরত্ব শুনেছি ১১ কিমি. এর মত। কিন্তু চলার বেগ ঘণ্টায় ২ কিমি করে ধরলে দূরত্ব আরো বেশি। আজ 'আলি বুগিয়ালে' থাকার কথা।

মাঝে মাঝে পথের ওপর থেকে আলো আসছে। মনে হচ্ছে এবার নিশ্চয় বুগিয়ালের ওপর উঠে এসেছি। কিন্তু ওপরে উঠে দেখি এক টুকরো সমতল জমির পর আবার জঙ্গল এবং চড়াই-এর শুরু। পথে যে ক-জন উল্টো পথের পথিকের সঙ্গে দেখা, সবারই এক কথা-পথ বেশ দীর্ঘ এবং বেলা ৩-৩০ এর আগে গন্তব্যে পৌঁছান যাবে না।

মাঝে মাঝে দু-চার ঘর বসতির গ্রাম পড়ছে পথে। এক জায়গায় দেখা গেল বন দপ্তরের একজন কর্মী পুরানো পচা গাছ কেটে সাফ করছে। আর এক জায়গায় দেখি কয়েকজন গ্রামের মেয়ে এক অচেনা গাছের ওপর উঠে ডাল পাতা কাটছে। জিজ্ঞেস করে জানা গেল গরুর খাবার সংগ্রহ হচ্ছে, গ্রামগুলি দেখে বোঝা যায় গো-পালনই এদের প্রধান বৃত্তি। জানা ছিল 'আলি বুগিয়ালে' গোয়ালার গ্রামই প্রধান, সেটা এবার চোখে দেখা গেল। শোনা গেল শীতের সময় এরা নীচের লোহাজঙ্গ পাসে নেমে যায়। কেবল ভেড়া-বকরিওয়ালা (পদচারণকারী)রা এখানে রয়ে যায়। বরফ পাত এই বুগিয়ালে তেমন ভয়ঙ্কর ভাবে হয় না।

একসময় চড়াই শেষ হয়ে বুগিয়াল শুরু হল। চারিদিকে বিশাল দিগ্‌চিহ্নহীন ঢালু তৃণভূমি। আকাশ মেঘে ঢাকা থাকায় বোঝা যাচ্ছে না কোথায় এগোব। বাধ্য হয়ে আমরা ৫/৬ জন দাঁড়িয়ে রইলাম গাইডের অপেক্ষায় যদি তারা পথের খোঁজ দিতে পারে।

বেশ কিছুক্ষণ এদিক ওদিক উঁকি ঝুঁকি মারার পর আমাদের তিনজন সামনের দিকে কোনাকুনি এগোতে থাকে। উদ্দেশ্যহীন ভাবে আমরাও এগোই। এক সময় বৃষ্টি শুরু হয় প্রবল বেগে। জামা কাপড় ভিজে একসা। সঙ্গে তীব্র হাওয়ার দাপট। কিছুক্ষণ স্থির দাঁড়িয়ে পলিথিন শীট দিয়ে বৃষ্টি ও হাওয়ার যুগ্ম আক্রমণ ঠেকাবার ব্যর্থ চেষ্টা করি। একসময় বৃষ্টি ও হাওয়ার আওয়াজ ছাপিয়ে কার যেন গলার আওয়াজ শোনা যায়। দেখি একজন পোর্টার আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। সে ইঙ্গিতে সামনের দিকে যেতে বলছে। আমরা আবার এগোতে থাকি ঢালু হয়ে আসা থাকে থাকে সাজানো তৃণ ভূমি ধরে। নানান রঙের অজস্র ছোট ছোট ফুলে মাঠ ঢাকা। ঘাসের ডগায় ডগায় বৃষ্টির ফোঁটা মুক্তার মত ঝক্ ঝক্ করছে। কয়েকটি ঘোড়া ও গরু এই বৃষ্টিকে অগ্রাহ্য করে চরে বেড়াচ্ছে। এদিকে জলে ভিজে উইন্ডচিটার পিছল হওয়ায় হ্যাভার স্যাক বার বার ঘষে কাঁধে ফোস্কায় জ্বালা করছে।

অবশেষে বৃষ্টির মধ্যেই ডানদিকে আবছা ঘরের উপস্থিতি ফুটে ওঠে। সেদিকে এগোতেই অন্য দিকে পাহাড়ের মাথায় তিনটি অর্ধবৃত্তাকার সবুজ-রঙের তাঁবু চোখে পড়ে। সেখান থেকে দলের কোন সদস্য সম্ভবতঃ হাত নেড়ে আমাদের এগোতে বলে। অবশেষে সেই পথে চলে যখন তাঁবুতে পৌঁছাই তখন বেলা ৩-৩০ মি.।

**২৪.৮.২০১১ ঃ** কাল বিকালে একবার আকাশের মেঘ সরে গিয়ে খুব আবছা ভাবে চৌখাম্বা ও ত্রিশূল শৃঙ্গ দুটি দেখা গিয়েছিল কিন্তু কয়েক মিনিটের মধ্যেই তা আবার মুছে সাদা হয়ে যায় আকাশের প্রেক্ষাপট। আজ সকালে ৯-৩০মি. নাগাদ বের হওয়া গেল পথে। পথ বাঁ দিকের ঢালু-বুগিয়াল ধরে ক্রমে উপরে উঠছে। খানিক এগিয়ে ডান দিকে মোড় নিতে স্লেট পাথরের ছাউনি দেওয়া এক ছোট দেবস্থান নজরে এল। ছোট কুলুঙ্গির মত তার প্রবেশ মুখে বনফুল, পাতা আর ধূপের দগ্ধাংশ চোখে পড়ে। পোর্টারদের কাছে জানা গেল এটি নন্দাদেবীর এক প্রতীকি দেবস্থান। দেবীর কাছে সফল যাত্রার জন্য প্রার্থনা করে এগিয়ে যাই আমরা। পথ তৃণ ভূমির গা বেয়ে ক্রমেই ডান দিকে উঠে গেছে। সকালবেলার পূর্ণ উৎসাহ নিয়ে চড়াই ভাঙতে থাকি। উপরের দিকে পথ

অনেকটাই সমতল মনে হয়। বাঁদিকে গভীর খাদ গড়িয়ে নেমে গেছে নীচের গাঢ় কাল্‌চে সবুজ ঝাউবনের মধ্যে।

প্রায় ১-৩০ মি. চলার পর দুজন পথিকের দেখা মেলে। ততক্ষণে সামনের পথ দু-ভাগ হয়ে, এক ভাগ নীচের দিকে ও অপর ভাগ উপরের দিকে বেঁকে গেছে। আমাদের জিজ্ঞাসার উত্তরে তারা ডান দিকের নিচে চলে যাওয়া পথটি দেখিয়ে দেয়। তাদের কাছে জানা যায়, উপরের পথ রূপকুন্ডের বিকল্প রাস্তা। নামতে নামতে একটু পরেই চোখে পড়ে বন দপ্তরের দুটি জানালা বিহীন গোলঘর এবং তার বেশ খানিক নীচে একটি মাঝারি মাপের জলাধার। বেশ কয়েক বছর আগে, এ পথে এক ব্যর্থ রূপকুন্ড অভিযানের সময় এগুলি হয়েছিল। যাই হোক, এবার আমাদের দলের শিবির করা হয়েছে, এক ছোট জলাধারা পেরিয়ে, পাকা দেওয়ালের উপর টিনের ছাউনী দেওয়া দুটি ঘরে। তারই একটিতে আমার ঠাঁই হয়। সামনের ছোট ময়দানে আমাদের চারটি রঙীন তাঁবু পড়েছে, দলের ১৬ জন সদস্য ও ১০ জন পোর্টার ও গাইডের জন্য। সামান্য কিছু জলযোগের পর বাইরে আসি। চারদিকে ঘন কুয়াশায় ঢাকা। ডাল, ভাত আর চাটনী দিয়ে দুপুরের খাবার খেয়ে গল্প গুজবে দুপুরটা কাটে। বিকালের দিকে হঠাৎ পশ্চিমের আকাশ পরিস্কার। অস্তগামী সূর্যের সোনালী আলোয় চারদিক ঝলমল করে ওঠে কয়েক মিনিটের জন্য। সবাই ছুটে বাইরে আসি ক্যামেরা নিয়ে। কিন্তু মেঘ আর পুরোটা কাটে না। সূর্যাস্তে মেঘের রঙীন খেলার ছবিই উঠতে থাকে ক্যামেরায় এরপর সকাল সকাল রাতের খাওয়া সেরে আমরা তাঁবুর মধ্যে আশ্রয় নেই। কাল 'বগুয়াবাসা' যাবার কথা। দীর্ঘ, কষ্টকর পথ তাই বিশ্রামের প্রয়োজন আজ সকলের।

**২৫.৮.২০১১ ঃ** আজ সকালে উল্লসিত সদস্যদের চিৎকারে ঘুম ভেঙে গেল। শুনলাম মৌসম নাকি খুলে গেছে। আকাশ ঝক্‌ঝক্ করছে সোনার মত রোদে। কোন রকমে চোখেমুখে জল দিয়ে ক্যামেরা নিয়ে বাইরে এসে দেখি পশ্চিমাকাশে চৌখাম্বার গায়ে সোনার ছোঁয়া লেগেছে। উত্তরে আলোয় উদ্ভাসিত ত্রিশূল পর্বত শৃঙ্গ। চৌখাম্বার পাশাপাশি ডানদিকে পিরামিড আকৃতির পর্বত শৃঙ্গটি নাকি নন্দা ঘুন্টির। ঝপাঝপ ক্যামেরা চলতে থাকে, কখন আবার সব মেঘে ঢেকে যায়। আর সত্যি সত্যিই একটু পরেই দেখি চৌখাম্বা চৌপাট মেঘের আড়ালে।

জিনিষপত্র গোছগাছ করে পথে নামতে বেলা ৭টা। উত্তরদিকে লক্ষ্য করে চলতে থাকি বেদিনী বুগিয়ালের ঢালু গা বেয়ে একটু উঠে কি মনে করে পিছন ফিরে তাকাই ফেলে আসা গত রাতের আশ্রয় ভূমির দিকে। দেখি কুন্ডের জলে নীল আকাশের ছায়া পড়ে মনে হচ্ছে, আকাশ যেন মাটিতে নেমে এসেছে। সমস্ত হ্রদটি যেন কার নীল চোখের চাউনি হয়ে গেছে। কিছু ছবি তুলে এগোতে থাকি ঢালু তৃণভূমি ধরে উপরের দিকে। এক সময় লক্ষ্য করি আলিবুগিয়াল থেকে একটি পথ এসে আমাদের পথে মিশেছে। কিছুক্ষণ চলার পর পথ পাহাড়ের উল্টো দিকে চলে যায়। সে পথের একদিকে নানা রঙের ফুলের প্রাকৃতিক বাগিচা অন্য দিকে পাহাড়।

বেলা ১১টা নাগাদ আসে পথের পাশে বন বিভাগের তৈরি এক সারি 'ট্রেকার্স হাট' অর্থাৎ 'পান্থ কুটির'। শোনা গেল এই জায়গাটিই পাথর নাচুনি নামে খ্যাত। লোক প্রচলিত, কাহিনী অনুযায়ী পার্শ্ববর্তী বিদেশী এক রাজ্যের রাজা তাঁর দলবল নিয়ে রানী সহ এখানে নন্দাদেবীর পূণ্য ভূমিতে এসেছিলেন বিলাস সঙ্গিনী নর্তকী সহযোগে। এই অনাচারে দৈবরোষে নর্তকীরা পাথরে পরিনত হয়। তাই এই নামকরণ। পথের একপাশে মানব-আকৃতির কিছু পাথরের স্তূপ দেখে এর কারণটা কিছু বোঝা যায়, সম্ভবত লোককাহিনীর উৎপত্তি এই কল্পনা থেকেই।

পথ ক্রমান্বয়ে উপরে উঠতে থাকে। শোনা গেল এই সেই বিখ্যাত কৈলুবিনায়কের চড়াই। চারদিকে কখন যেন ঘন কুয়াশায় ঢাকা পড়েছে। বৃষ্টি শুরু হয় এক সময়। সঙ্গে হাওয়ার ঝাপট। দু হাতে পলিথিনের ঢাকা সামলে চলতে থাকি যন্ত্রের মতো। তবে সব দুঃসময়ের মত এ পথও শেষ হয় এক সময়। বেলা ১টার সময় কৈলুবিনায়কের সামনে এসে পড়ি। গিয়ে দেখি আমাদের কয়েকজন পোর্টার এর মধ্যেই পৌঁছে গেছে। তারা দেবমূর্তির সামনে বুনো ফুল সাজায়, ধূপ জ্বেলে দেয়, তারপর কৈলুবিনায়ক' বা কালো পাথরের নৃত্যরত সালঙ্কার মূর্তির সামনে রাখা শাঁখে ফুঁ দেয়। পথের দেবতার কাছে শ্রদ্ধা জানিয়ে এবং অভিযানের সাফল্য কামনা করে আবার পথে নামি। পথ এবার খানিকটা সমতল ধরে গিয়ে ঢালু হয়ে নেমে গিয়েছে। বৃষ্টি চেপে আসে, সঙ্গে হাওয়া। পলিথিনে ঢাকা হাতের বাঁধন ছিঁড়ে উড়ে যেতে চাইছে। সঙ্গী পোর্টারদের মুখে জানা যায় আমাদের ক্যাম্পের জায়গা এই পথের পাশে পড়বে। আরো খানিক এগিয়ে এক জায়গায় টালির মত পাথরের স্তর সাজিয়ে করা ছাদ হীন কয়েকটা ঘর চোখে পড়ে। পরিত্যক্ত বোঝা যায়। পথ থেকে চোখ তুলে পাশের প্রান্তরে পড়তেই মনটা লাফিয়ে ওঠে। রুক্ষ্ম ঝুরো পাথরের প্রান্তর জুড়ে অজস্র ব্রহ্ম কমলের মেলা।

যেন আলো হয়ে গেছে চারদিক। হাল্কা কুয়াশা আর ঠান্ডা বাতাসে নরম হলুদ আগুনের শিখার মত উর্দ্ধমুখী পাপড়ি মেলে তারা যেন কেঁপে কেঁপে উঠছে।

আরো এগিয়ে পথের বাঁ পাশে আরো কয়েকটি ভাঙা চোরা ঘর চোখে পড়ে। তারপরই বাঁ দিকে তীক্ষ্ণ বর্শা ফলকের মত পাথরে কণ্টকিত এক প্রান্তরের মধ্যে বনবিভাগের সেই বহু পরিচিত সবুজ রঙের ট্রেকার্স হাট। আর তার সঙ্গে কয়েকটি রঙীন তাঁবু। আমাদের অগ্রবর্তী সহযাত্রীদের দেখে এগিয়ে যাই। ঘড়িতে সময় তখন বেলা ১.৪৫ মি.।

বিশ্রাম নেবার পর তাঁবুতে ঢুকি। একটু পরেই বৃষ্টি শুরু হয় প্রবল বেগে। নিরুপায় হয়ে তাঁবুর মধ্যে Mat পেতে স্লিপিং ব্যাগের বালিশ বানিয়ে তাতে মাথা রেখে শুয়ে থাকি। ঘুমঘুম পায়। একসময় টের পাই মাথা ধরতে শুরু করেছে। মনে পড়ে যায় ট্রেকিং করে এসেই শুয়ে পড়াটা ঠিক নয়। ফের উঠে বসি। একসময় বৃষ্টি শেষ হয়। বাইরে থেকে দলের কয়েকজন সদস্য কোলাহল করে ওঠে 'আকাশ ছেড়ে গেছে' হুড়মুড় করে বাইরে আসি। দেখি সামনে চৌখাম্বা পশ্চিমে সিলুয়েট হয়ে। ডান পাশে উত্তরদিকে প্রায় হাতের কাছে এক পর্বত শৃঙ্গকে দেখিয়ে এক পোর্টার সেটিকে চেনায় 'নীলকণ্ঠ' নামে। চৌখাম্বার পাশে সারি সারি দেখা যায় হাতি পর্বত, ঘোড়া পর্বত ও নন্দাঘুন্টিকে। চারদিক রোদে ঝলমল্। একটু পরে সূর্যাস্ত হয়। অনুপম রঙীন দৃশ্য। অনেকক্ষণ পর্যন্ত আকাশে তার রেশ থাকে। তারপরই তাড়াতাড়ি খাওয়া সেরে স্লিপিং ব্যাগের মধ্যে সবাই আশ্রয় নিই। আগামীকাল আকাশ একেবারে ছেড়ে যাবে এই আশা নিয়ে তাঁবুর ভিতর ঘুমিয়ে পড়ি।

**২৬.৮.২০১১ ঃ** সকাল থেকেই কিন্তু যথারীতি আকাশ ঘন কুয়াশায় ঢাকা, সঙ্গে টিপ্‌টিপ্ করে বৃষ্টিও। দলের কিছু সদস্য এই আবহাওয়া দেখে আর এগোতে সাহস পায় না। আজ আমাদের গন্তব্য রূপকুন্ডে পৌঁছাবার আজই শেষ সুযোগ এ যাত্রায়। আমি তাই তাঁবুর ভিতর যা কিছু যে অবস্থায় আছে রেখে অগ্রগামী অভিযাত্রীদের অনুসরণ করে পলিথিনের আড়াল দিয়ে এগিয়ে বৃষ্টির মুখোমুখি হই। পথ ক্রমশঃ ঢালু হতে হতে নেমে গেছে। এ পথেই মানচিত্রের বয়ান অনুযায়ী ২.৫ কিমি দূরে 'রানী কি সুলেরা' বা 'রানীর আঁতুড় ঘর'। এবং তারপর ২.৫ কিমি পর 'হুনিয়া থর'। শোনা ছিল 'হুনিয়া থরের' পর পথ কিছুটা বিপজ্জনক হতে পারে। আপাততঃ দেখি পথে টালির মত চ্যাপ্টা পাথর বিছানো, সাবধানে পা ফেলি। পাথরের ধারে পা পড়লেই পাথর ঘুরে যাচ্ছে। যার পরিনতি আছাড় খেয়ে হাত-পা ভাঙা পর্যন্ত হতে পারে। পথে বেশ কয়েকটা ঝর্ণা দেখা গেল। সাবধানে আলগা পাথর এবং জল এড়িয়ে যেতে হচ্ছে। এভাবে কিছুটা পথ যাবার পর দেখি ভাঙা স্লেট পাথরে সাজানো সিঁড়ি খাড়া উঠে গেছে পাহাড়ের গা বেয়ে। উঠতে থাকি সাবধানে পলিথিন দিয়ে বৃষ্টি আড়াল করে পথ বাঁদিকে বাঁক নিয়েছে যেখানে, সেখানে দেখি বেশ কয়েকটা ধাপ নেই। এদিকে দু হাতে পলিথিন ধরে থাকায় দু হাতই জোড়া। জল পড়ে পড়ে পথও পিছল। বহু কষ্টে পাহাড়ের খাঁজে বেরিয়ে থাকা পাথরের টুকরো ধরে উঠে আসি। এর পরের অল্প কিছুটা পথ আবার সামান্য চড়াই। পাথরে মোটামুটি সাজানো এবং চিহ্নিত। কিন্তু যত উপরে উঠি দেখি পথের নিশানা আবছা থেকে আবছাতর হয়ে এসেছে। বড় বড় কালো পাথরের চালু বোল্ডার বিরাট বন্য মহিষের পিঠের মত এলিয়ে পড়ে আছে। তার ওপরে কোথাও কোথাও ক্ষীণ ভাবে সামান্য পাথরের গুঁড়ো ছড়িয়ে বোধ হয় পথের অস্তিত্ব নির্দেশ করা হচ্ছে। কিছুটা পথ ওই ভাবে যাবার পর তাও নেই। মাটি পাথরে মেশা নরম অস্পষ্ট পথ রেখা প্রায় নিজেকেই আবিষ্কার করে নিতে হচ্ছে। বেশ কিছুটা পথ এভাবে যাবার পর মাথা তুলে তাকিয়ে এক সময় দেখা গেল ডান দিকে কালো এবড়ো খেবড়ো পাথরের মাথায় কয়েকজন মানুষের ছায়ামূর্ত্তি নড়াচড়া করছে। শোনা গেল ওখানেই আমাদের গন্তব্য রূপকুন্ড। একটু পরে দলের দুজন সদস্যকে পোর্টার নিয়েই ঐ পথে নেমে আসতে দেখা গেল। ওঠার দুর্গম পথ দেখে চিন্তায় ছিলাম—এই ভরা বর্ষার মধ্যে কুয়াশা ঢাকা এই পথে আবার নামবো কি ভাবে। এদের দেখে কিছুটা ভরসা পেলাম। এদের মুখে শুনলাম পথ আর অল্পই বাকি। আরও কিছুক্ষণ ওঠার পর ডানদিক ঘুরে পাহাড় কিছুটা সমতল। সেখানে একপাশে এক মন্দিরের ক্ষুদ্র সংস্করণ। স্লেট পাথর সাজিয়ে সাজিয়ে একটা দেবায়তনের আদল দেওয়া হয়েছে। ধূপ, ফেন কমল, শাঁখ, ঘন্টায় সাজানো এক পূজা হলের চেহারা। সামনে পাথরের এক বড় খন্ডের উপর এক নর করোটি এবং বেশ কিছু অস্থি। করোটির আকার বেশ ছোট। মনে হয় এর অধিকারী ও আকৃতিতে বামনাকার ছিল। এ সম্পর্কে প্রচলিত এক মতের মধ্য দিয়ে জেনেছি যে তিব্বতের এক রাজার সেনাবাহিনী যুদ্ধ যাত্রা করে এ পথে এলে শিলাবৃষ্টির দাপটে নিহত হয়। এ সব দেহাবশেষ তাদেরই। অন্য মতও আছে, সেখানে বলা হয় এরা সন্নিহিত কোন এক দেশের তীর্থযাত্রী এক রানীর লোক লস্কর। এখানে বিরূপ প্রাকৃতিক দুর্যোগের শিকার।

এসবের অর্থাৎ দেবস্থান, বেদীতে সাজানো নর করোটি ও অস্থি ইত্যাদির পিছনে প্রায় ৬০/৭০ ফুট নীচে বাটির মতো পরিসরের এক স্বচ্ছ কুন্ড। দু পাশে গ্লেসিয়ার নেমে কুন্ডের জলে মিশেছে। কুন্ডের চারদিকে জলের কিনারা ঘেঁষে পাথুরে ভিজে মাটিতে অজস্র হাড় গোড়, হঠাৎ দেখে মনে হয় গাছের ভাঙা ডালপালা। কিছু ছবি তোলা হয়। ফের উপরে উঠে পোর্টারদের জিজ্ঞাসা করে জানা যায় বাঁদিকে নীচে থেকে উঠে আসা ঐ আঁকা বাঁকা পায়ে চলা পথই উঠে গেছে জিউনার গলি গিরিবর্ত্ম বা কলের দিকে। এ পথের ডান পাশে এক বিশাল হিমবাহ তার শুভ্র প্রান্তর নিয়ে সকালবেলার এই মেঘলা-চাপা আলোতেও ঝক্ ঝক্ করছে। পথের পাশে ফুটে রয়েছে বেশ কিছু ফেন কমল। নীচে এদের দেখা যায়নি। সেখানে শুধুই 'ব্রহ্ম কমলে'র মেলা। ফেন কমলের ফুল গুলিকে হঠাৎ দেখে শ্বেত পাথর বলে মনে হয়। ভুঁই চাঁপার মত মাটি থেকে সটান উঠে এসেছে। সাদা চামরের মত এর পাপড়ি।

পোর্টারদের বলি 'জিউনার' গলি কল পর্যন্ত কিছুটা এগিয়ে যাব সঙ্গে চল তারা সোৎসাহে রাজী হয়। এর মধ্যে আশপাশের মেঘ কুশায়া কেটে গিয়ে পথ এবং চারপাশ পরিস্কার হয়েছে। কিন্তু কয়েক পা এগোতেই টের পাই দমের ঘাটতি হচ্ছে। প্রথমতঃ এ পর্যন্ত হেঁটে আসার পথ শ্রম, তার সঙ্গে ক্রমশঃ পাতলা হয়ে আসা অক্সিজেন স্তর সম্ভবত এর জন্যে দায়ী। পোর্টারা কিন্তু অনায়াসে হরিণের গতিতে তর্ তর্ করে এগিয়ে যায়, দেখে ঈর্ষা হয়। এদিকে আবার চারপাশে কুয়াশা ঘনিয়ে আসায় গাইড নীচে নেমে যাবার জন্য তাগাদা দিতে থাকে। ততক্ষণে পোর্টাররা অনেক দূর এগিয়ে গেছে। দু এক জন তো কলের মাথায় গিয়ে উঠে পড়েছে এরমধ্যেই সেখান থেকেই গাইডকে উদ্দেশ্য করে নিজেদের ভাষায় কি সব বলতে থাকে। গাইড তার অনুবাদ করে আমাদের জানায় ওরা বলছে উপরে গিয়ে কোন লাভ নেই। ওখানে সব কুয়াশায় ঢাকা। শুনে সান্ত্বনা পেলেও মন যেন ভরে না। এবার ফেরার পালা। কারণ হেমকুন্ড, রনিট হয়ে লাটাখোপরির জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে সীতল, সুতেল হয়ে ফেরার পরিকল্পনা আগেই বাতিল হয়েছে।

ফেরার পথে পোর্টাররা দেবস্থানে চক্লেট, বিস্কুট সহকারে পূজো দেয়, ধূপ জ্বালিয়ে শঙ্খধ্বনি করে। আমরাও অন্য পথে রন্টি আসার কামনা করে পথের দেবতার উদ্দেশ্যে প্রার্থনা জানিয়ে ফেরার পথ ধরি।

আমাদের Guide নন্দন সিং ধানু, Phone - 09411661147। পরিচালনায় ঃ Tarit Memorial Mountaineering & Trekking Association, Netaji Nagar, Kolkata-92.

বাৎসরিক অনুষ্ঠান ২০১১
শ্রুতি নাটক - 'পিতৃপক্ষ'

# ভারতের ঐতিহ্য : কিছু ভাবনা

রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

একটা কথা আজকাল প্রায়ই শোনা যায়। সেটা হলো : ভারতীয় ঐতিহ্য। অনেকেই বলেন: ভারতের ঐতিহ্য মানে বেদ-উপনিষদ্, *রামায়ণ-মহাভারত, গীতা,* বেদান্ত দর্শন—এইসব। এককথায়, আধ্যাত্মিকতা, ভক্তি, ভগবানে বিশ্বাস—এ-ই হলো আমাদের ঐতিহ্য। আরও এগিয়ে কেউ কেউ বলেন : এই ঐতিহ্য রক্ষা করাই আমাদের একমাত্র কাজ। পশ্চিমী সভ্যতার মায়ায় ভুলে ইহজগতের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যকে বড় করে দেখছি, ধর্মকর্মে মন দিচ্ছি না—এটা আমাদের ঐতিহ্যের বিরোধী।

যাঁরা এসব বলেন তাঁদের খাওয়া-পরার অভাব নেই। শুনে শুনে তাঁদের কথাগুলোই বিশ্বাস করতে শেখেন আরও কিছু লোক। ইহজগতের সুখ-দুঃখকে তাঁরাও আর বড় করে দেখেন না, কারণ সেটা ঐতিহ্য-বিরোধী হবে।

ঐতিহ্য নিয়ে এই সংস্কার শেকড় গেড়ে বসে আছে। তার উল্‌টো কথা শুনলে হয়তো একটু অবাক লাগবে। আর শোনা মাত্রই সব ধারণা আমূল বদলে যাবে—এমন মনে করারও কোনো কারণ নেই। তবু উল্‌টো কথা দু-একটা বলা যাক। যিনি পড়বেন তিনিও অন্তত একবার ভেবে দেখার সুযোগ পাবেন।

পৃথিবীতে খুব অল্প দেশেই সভ্যতা ও সংস্কৃতির একই ধারা বজায় থেকেছে। তেমন দুটি দেশ হলো ভারত ও চীন। নতুন অনেক কিছু যোগ হলেও পুরনো ধ্যানধারণা একেবারে মরে হেজে যায় নি। আসিরিয়া বা মিশর সম্পর্কে বলা যাবে না সে-কথা। বাইরে থেকে আক্রমণ, ভেতর থেকে রদবদল—দু-এ মিলে তাদের সভ্যতা-সংস্কৃতির খোলনলচে পাল্‌টে গেছে। গ্রীস ও রোম-এর ক্ষেত্রেও একই কথা। বহু দেবদেবী উপাসনার জায়গায় সেখানে এল নতুন এক ধর্ম—খ্রিস্টধর্ম, ইরাক ও মিশর-এ যেমন পরে এল ইসলাম।

ভারতে এমন ঘটে নি। এখানে বাইরে থেকে অনেক ধর্ম এসেছে (বিশেষ করে ইসলাম ও খ্রিস্টধর্ম), কিন্তু পৌরাণিক দেবদেবীরা আজও পুজো পান। এছাড়াও আছেন অজস্র গ্রাম্য দেবদেবী, বেদ-এ বা পুরাণ-এ যাঁদের নাম নেই। তেমনি জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত চালু আছে নানা সংস্কার—অন্নপ্রাশন থেকে শ্রাদ্ধ।

এর থেকেই কেউ কেউ মনে করেন : বাইরের আঘাত সত্ত্বেও ভারতের আদি ধর্ম যে টিকে আছে সেটা তার প্রাণশক্তির প্রমাণ।

পৌরাণিক ও গ্রাম্য দেবদেবীরা যে টিকে আছেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু শুধু টিকে থাকাই কি শ্রেষ্ঠতার প্রমাণ? ধর্মের পাশাপাশি টিকে আছে অসীম দারিদ্র্য, হাঁচি-টিকটিকি নিয়ে অদ্ভুত সব কুসংস্কার, সামাজিক অনাচার, বৈজ্ঞানিক জ্যোতির্বিদ্যার জায়গা দখল করেছে জ্যোতিষশাস্ত্র, চরক-সুশ্রুত-এর আয়ুর্বেদ-এর বদলে গুরুর পা-ধোয়া জল। ঘোড়ার গাড়ির চেয়ে তাড়াতাড়ি যাওয়ার কোনো উপায় তৈরি হয় নি। জীবনও চলত গতানুগতিকভাবে—যতদিন না বাইরে থেকে এল নতুন বিজ্ঞান ও কারিগরিবিদ্যা। যে-ঐতিহ্য নিয়ে গর্ব করা হয় তা আমাদের মানুষের মতো বাঁচতে শেখায় নি; বুদ্ধিতে শান দেয় নি। তা শিখিয়েছে সব অনাচার-অত্যাচার মেনে নিতে, পড়ে পড়ে মার খেতে। এই ঐতিহ্য নিয়ে গর্ব করার আছেটা কী?

তাহলে কি আমাদের ঐতিহ্যে গর্ব করার মতো কিছুই নেই? নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু সেগুলোর কথা বড় একটা বলা হয় না। আমরাও তাই খেয়াল করি না।

ধরুন, সুতির কাপড়। তুলো থেকে সুতো বার করে, তাঁতে বুনে এটি তৈরি করা হয়। বিশ্বসংস্কৃতির ইতিহাসে এটি ভারতেরই দান। এর জন্যে আমরা ন্যায্যতই গর্ব করতে পারি।

কেউ হয়তো নাক কুঁচকে বলতে পারেন: ছ্যা-ছ্যা, ধুতি-শাড়ির মতো তুচ্ছ জিনিসকে সংস্কৃতির আলোচনায় আনা কেন? সংস্কৃতি মানে তো নাচ গান বাজনা, বা আরও উচ্চাঙ্গের দর্শন, কাব্য ইত্যাদি।

এমন মনে করলে সংস্কৃতিকে ভুল বোঝা হবে। আসলে সংস্কৃতি মানুষের জীবনযাত্রার সমস্ত দিক নিয়েই। দর্শন কাব্য নাচ গান—সবকিছুর আগেই মানুষের বেঁচে থাকা চাই। তার জন্যে দরকার ঠিকমতো খাবার, কাপড়, মাথা গোঁজার ঠাঁই। কাঁচা জিনিস না খেয়ে রান্না খাবার খাওয়া—এও সংস্কৃতিরই অঙ্গ। তেমনি গাছের ছাল ও পশুর চামড়া ছেড়ে বোনা কাপড় গায়ে দেওয়া সংস্কৃতির পরিচয়।

তেমনি ধরুন, বিজ্ঞান। সেখানেও আমাদের গর্ব করার মতো জিনিস আছে। দশমিক অঙ্কচিহ্ন 1 থেকে 9, তারপরে 0 এইভাবে 10, 20, 30, ... ..., 100 ইত্যাদি—এও তো ভারতেরই সৃষ্টি। আরবরা এই পদ্ধতি নিয়ে যান ইওরোপ-এ। খ্রিস্টীয় তেরো শতক থেকে আস্তে আস্তে এটা সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে। অদ্বৈত বেদান্ত-র ব্রহ্মর চেয়ে 'শূন্য' অনেক

বেশি উপকারী। কিন্তু গর্ব করা হয় ব্রহ্ম নিয়ে, দশমিক অঙ্কচিহ্ন নিয়ে নয়।

দর্শনের জগতে আমাদের গর্ব করার দর্শন হলো চার্বাক বা লোকায়ত। এক আপসহীন বস্তুবাদী দর্শন। আত্মা, পরলোক, বেদপ্রামাণ্য, ধর্মীয় আচার-আচরণ (বিশেষ করে শ্রাদ্ধ)—সব কিছুকেই এ দর্শন খারিজ করে দেয়। বেদ উপনিষদে এ দর্শনের নাম নেই, কিন্তু বস্তুবাদী ধারণার আভাস সেখানেও আছে। বুদ্ধ-র সমসময়ে একজন দার্শনিকের কথা জানা যায়। তাঁর নাম অজিত কেসকম্বল। ঈশ্বর-পরকাল-স্বর্গ-নরক ইত্যাদি কোনো অলৌকিক ধারণায় তিনি বিশ্বাস করতেন না। খ্রিস্টীয় চার শতক থেকে 'লোকায়ত' বলতে এই ধরণের দর্শনই বোঝায়। শঙ্করাচার্য প্রমুখ ধার্মিক দার্শনিকরা এই দর্শনকে 'লোকায়ত' বলেছেন। খ্রিস্টীয় আট-ন শতক থেকে লোকায়ত-র পাশাপাশি 'চার্বাক' নামটিও পাওয়া যাচ্ছে। তারপর থেকে আঠেরো শতক অবধি ভারতের নানা মতের ভাববাদীরা (ব্রাহ্মণ্য, বৌদ্ধ ও জৈন) এই দর্শনটি খণ্ডন করার চেষ্টা করেছেন, উপেক্ষা করতে পারেন নি। অন্তত আড়াই হাজার বছর ধরে এমন একটি দর্শন ভারতে বহাল থেকেছে—এ কি কম গৌরবের কথা?

অথচ এই দর্শনের কোনো মূল বই আজ পর্যন্ত পাওয়া যায় নি। তবু লোকের মনে নিশ্চয়ই তার ছাপ থেকে গিয়েছিল। তাই এটিকে এড়িয়ে গিয়ে কিছু করা ভাববাদীদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। কোনো রাজশক্তি বা বণিক সম্প্রদায়ের পৃষ্ঠপোষকতা না পেয়েও একটি দর্শন বেঁচে রইল, বারে বারে খণ্ডনের চেষ্টা সত্ত্বেও প্রত্যেক শতাব্দীতেই সেই একই কাজ করে চলতে হলো—এতেও তো এক অসামান্য সজীবতার প্রমাণ পাওয়া যায়। এটিকে তাহলে ভারতের ঐতিহ্য বলে ধরা হবে না কেন?

ভারতের যে-ঐতিহ্য নিয়ে গর্ব করা উচিত সেটি ছেড়ে আমরা ভুল পথে যাই। আমাদের গৌরব করা উচিত খ্রিস্টপূর্ব চার শতকের ব্যাকরণবিদ্ পাণিনিকে নিয়ে। আমাদের শ্রেষ্ঠ জ্যোতির্বিদ্ আর্যভট (খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতক) পৃথিবীর আহ্নিক গতির কথা বলেছিলেন। এঁকে কি আমরা তেমন করে মনে রাখি? এছাড়া আছেন নাম না-জানা বহু স্থপতি, ভাস্কর, কারু ও চারু শিল্পী। এঁদের কি আমরা ভারতের ঐতিহ্যের বাহক বলে স্বীকার করি? কোথাও এঁদের নাম লেখা নেই, কিন্তু কীর্তির প্রমাণ তো রয়েছে।

---

# শততম মর্কট কাহিনী

**অনামী শর্মা***

আগে থেকেই বলে নেওয়া ভালো এটা কোনও জাতকের কাহিনী নয়। আর পঞ্চতন্ত্র বা হিতোপদেশ থেকেও এ কাহিনী নেওয়া হয়নি। এটা দানবিক পারমাণবিক শক্তির ভীতিপ্রদ এবং বিষাদজনক কাহিনী। তবে এই অদ্ভুত নামকরণ কেন? সেই প্রসেঙ্গেই আসছি।

বিদেশে থাকাকালীন অপ্রত্যাশিতভাবে একটা বই আমার হাতে আসে। বইটার নাম *The Hundredth Monkey* বা শততম মর্কট। লেখক কেন্ কীজ, জুনিয়ার (Ken Keyes, Jr—পিতা এবং পুত্রের যদি একই নাম হয় তবে তফাত করবার জন্য পিতার নামের পরে সিনিয়ার এবং পুত্রের নামের পরে জুনিয়ার লেখার প্রথা ওদেশে চালু আছে)। বইটার নামই শুধু অদ্ভুত নয়, বইটার মলাট, কপিরাইট সম্বন্ধে বিবৃতি এবং উৎসর্গপত্র সবই অদ্ভুত। বইটার সামনের মলাটের উপর সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে—''পারমাণবিক যুদ্ধে কোনও আরোগ্য নেই আছে কেবল প্রতিরোধ।'' কথাটা স্পষ্টই রোগ সম্বন্ধে সুপরিচিত সাবধান বাণী, Prevention is better than cure-এর সময়োপযোগী পরিবর্তিত রূপ। আর বইটার পেছনের মলাটের উপর বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক আলবার্ট আইনস্টাইনের সতর্কবাণী উদ্ধৃত করা হয়েছে। ''পরমাণু বিভাজনের ফলে মানুষের চিন্তাধারা ছাড়া আর সবকিছুরই আমূল পরিবর্তন হয়ে গেছে। আর এর ফলে আমরা এমন

* অনামী শর্মা প্রয়াত বিজ্ঞানী ড. সরোজবন্ধু ঘোষের ছদ্মনাম। ড. ঘোষ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে *সরকারি বিচারে গুরুত্বপূর্ণ* গবেষণাকর্মে নিযুক্ত ছিলেন। লেখাটি বিংশ শতাব্দীর শেষভাগে লেখা।

একটা সর্বনাশের দিকে এগিয়ে চলেছি, যার কোনও তুলনাই নেই।"

বইয়ের যে পাতায় সাধারণত বিবৃতি থাকে—লেখক (বা প্রকাশক) কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত, সেখানে তার বদলে বড় বড় অক্ষরে লেখা আছে, ''এই বইয়ের কোনও কপিরাইটই রাখা হয়নি।" তারপর আছে, ''আপনাদের অনুরোধ করা হচ্ছে, এই বইটা আংশিক অথবা সামগ্রিক ভাবে যতগুলি ভাষায় সম্ভব অনুবাদ করে, মূল্য নিয়ে অথবা বিনামূল্যে, যত বেশি লোকের মধ্যে সম্ভব বিতরণ করুন। পারমাণবিক বাস্তবতা সম্বন্ধে মানবজাতিকে দ্রুত সাবধান করা সবচেয়ে বড় প্রয়োজন। কারণ আগামী কয়েক বছরের মধ্যে পারমাণবিক যুদ্ধে আমরা যদি সর্বাত্মক ধ্বংসকে ডেকে আনি তবে বর্তমানে আমরা যা কিছু করি না কেন, তার মূল্য কতটুকু!"

আমি একজন সর্বগ্রাসী পাঠক। জীবনে বেশ কয়েক হাজার বই পড়েছি। কিন্তু কোনও বইয়ের কপিরাইট সম্বন্ধে এরকম অদ্ভুত উক্তি এর আগে আমার নজরে আসেনি। বইটির বিষয়বস্তু সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। কিন্তু কোনও উৎসাহী প্রকাশক 'পারমাণবিক চেতাবনী'র এই বইটি যদি সমগ্রভাবে ইংরেজি ভাষায় প্রকাশ করতে চান, প্রয়োজন হলে আমার বইটির কপি তাঁকে ধার দিয়ে সাহায্য করতে পারি। বইটির বহুল প্রচার হলে তাতে ভারতবর্ষের তথা সমগ্র বিশ্বের অধিবাসীই উপকৃত হবেন বলে আমার ধারণা।

বইটির উৎসর্গপত্রের মধ্যেও অদ্ভুত রকম একটা মৌলিকত্ব আছে। বইটি উৎসর্গ করা হয়েছে ডাইনোসরদের প্রতি। উৎসর্গপত্রে লেখা—''এই বইটি ডাইনোসরদের (স্মৃতির উদ্দেশে) উৎসর্গ করা হল; তারা মৌনভাবে আমাদের সাবধান করে দিচ্ছে যে, একটি প্রজাতি যদি পরিবর্তিত অবস্থার মধ্যে মানিয়ে নিতে না পারে তাহলে (তারা) লুপ্ত হয়ে যাবে।"

পারমাণবিক অস্ত্র এবং পারমাণবিক শক্তির তাৎক্ষণিক এবং সুদূরপ্রসারী ক্ষতিকর প্রভাব সম্বন্ধে কতগুলি বর্ণনা ও বিশেষজ্ঞদের বহুসংখ্যক প্রাসঙ্গিক বিবৃতির উদ্ধৃতিই এলোমেলোভাবে বইটার অধিকাংশ স্থান জুড়ে আছে। একই ধরনের বিবৃতির বহুল পুনরুক্তির ফলে মাঝে মাঝে বেশ একঘেয়ে হয়ে উঠেছে। বিবৃতিগুলির কিছু ছাঁটকাট করে আমার টীকাটিপ্পনি জুড়ে বিষয়বস্তু অনুসারে যতদূর সম্ভব সাজিয়ে দিয়ে পরিশেষে আমার নিজস্ব মতামত প্রকাশ করা ছাড়া সে-ত্রুটির বিশেষ একটা সংশোধন করা হয়ে ওঠেনি। কিন্তু আমি সুখপাঠ্য কথাসাহিত্য রচনা করতে বসিনি। মূল গ্রন্থের মতো এই প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয়, যে করাল ভয়ঙ্কর মৃত্যুর প্রতিচ্ছায়া সারা পৃথিবীর ওপর পক্ষ সঞ্চার করে নিঃশব্দে নেমে আসছে, সে-সম্বন্ধে যদি আমার পাঠক পাঠিকাদের সচেতন করতে পারি এবং তারা যদি এই সমস্যার সমাধানে সচেষ্ট হন, তবেই এই প্রবন্ধ রচনা সার্থক হয়েছে মনে করব। আর একই ধরনের কথা বার বার বলে মনের গভীরে বিষয়বস্তুটি গেঁথে দেওয়াই বইটির একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল।

বইটির প্রারম্ভে লেখক পাঠকদের উদ্দেশ্যে বলেছেন, ''আমার সঙ্গে এই মেগাটন পাগলামির নাটকে অংশগ্রহণ করবার জন্য আপনাদের অভিনন্দন জানাচ্ছি।"

**দুই**

এই গ্রন্থে (এবং স্বভাবতই এর ভিত্তিতে লেখা আমার বর্তমান প্রবন্ধে) কোনও তুচ্ছ বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়নি, আমাদের জীবন এবং আমাদের পৃথিবী কীভাবে পরিচালনা করা উচিত সে সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে; কী করে আমাদের বেঁচে থাকতে হবে সে কথা এতে বলা হয়েছে। যে বিপদ আমরা ডেকে এনেছি তা যেমন সর্বনাশের তেমনি ধ্বংসাত্মক এবং চ্যালেঞ্জিং। যে বিস্তৃত চিত্র এতে দেওয়া হয়েছে তা পারমাণবিক শক্তির বিপদের পরিমাণ করে, তেমনি এ থেকে প্রতিরক্ষা বা আত্মরক্ষার ব্যর্থতা সম্বন্ধেও প্রতীতি হয়। এই নূতন সচেতনতার শক্তি এবং প্রকাশমান নাটকে আপনার ভূমিকার কথাও এতে বলা হয়েছে। মনে হয় আমাদের প্রজাতির ভবিষ্যতের একমাত্র আশার কথা আছে শততম মর্কটের কাহিনীতে। সেই কাহিনীটাই এবার শুনুন।

ত্রিশ বছরেরও বেশি সময় ধরে প্রাকৃতিক পরিবেশে মুক্ত অবস্থায় এক শ্রেণীর জাপানি বাঁদরের (বৈজ্ঞানিক নাম Macaca Fuscata) ওপর একটা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা চালানো হয়েছিল। 1952 সালে কোশিমা দ্বীপে বিজ্ঞানীরা বাঁদরগুলির জন্য বালির ওপর মিষ্টি আলু ফেলে দিচ্ছিলেন। কাঁচা আলুর মিষ্টি স্বাদ ওরা পছন্দ করছিল, কিন্তু তারা দেখে বালি মাখা থাকায় আলুগুলো বিস্বাদ হয়ে গেছে। ইমো নামে আঠেরো মাস বয়সের একটি মাদি বাঁদর প্রথমে লক্ষ করে সামনের নদীতে আলুগুলো ধুয়ে নিলেই এই সমস্যার সমাধান হয়। তার মাকে সে এই কৌশলটা শিখিয়ে দেয়। তারপর তার সমবয়সী সাথিদেরও এই নূতন পদ্ধতিটা শিখিয়ে দেবার

ফলে তারা আবার তাদের মায়েদেরও এটা শিখিয়ে দেয়। এই ''সাংস্কৃতিক আবিষ্কার'' বিজ্ঞানীদের চোখের সামনেই বিভিন্ন বাঁদর ধীরে ধীরে গ্রহণ করছিল। 1952 সাল থেকে 1958 সালের মধ্যে দেখা গেল সমস্ত অল্প বয়সী বাঁদরেরা বালিমাখা মিষ্টি আলুগুলো জলে ধুয়ে নিয়ে কীভাবে সুস্বাদু করে নিতে হয় শিখে ফেলেছে। বয়স্ক বাঁদরদের মধ্যে যারা তাদের বাচ্চাদের অনুকরণ করতে পেরেছিল কেবলমাত্র তারাই এই ''সামাজিক বিবর্তন''টা শিখতে পেরেছিল। অন্য বয়স্ক বাঁদরেরা নোংরা মিষ্টি আলুই খেতে লাগল।

তারপর একটা আশ্চর্য ঘটনা ঘটে। 1958 সালের শরৎকালে দেখা গেল কোশিমা দ্বীপের একটা নির্দিষ্ট সংখ্যক বাঁদর মিষ্টি আলুগুলো ধুয়ে নিয়ে খাচ্ছে। এদের সঠিক সংখ্যাটা অবশ্য জানা যায়নি। ধরে নেওয়া যাক, একদিন ভোরবেলা যখন সূর্য উঠেছে সে সময় কোশিমা দ্বীপের নিরানব্বুইটি বাঁদর তাদের মিষ্টি আলুগুলি ধুয়ে নেবার কৌশল আয়ত্ত করেছে। তারপর ধরে নেওয়া হলো, সেই ভোরেই একটু পরে শততম বাঁদরটাও আলু ধুয়ে নেবার কৌশল শিখে গেছে। ঠিক তার পরেই সেই আশ্চর্য ঘটনাটা ঘটে। সেই দিন সন্ধ্যাবেলা দেখা গেল বাঁদরগুলির প্রায় সকলেই খাবার আগে মিষ্টি আলুগুলো ধুয়ে নিচ্ছে!

এই শততম মর্কটটির সংযোজিত শক্তি যেন জ্ঞানরাজ্যের রুদ্ধদ্বার খুলে দিল। বিজ্ঞানীরা আশ্চর্য হয়ে তারপর লক্ষ করলেন মিষ্টি আলু ধুয়ে নিয়ে খাবার কৌশলটা স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে সাগরের ওপারে গিয়ে পৌঁছেছে। অন্য সব দ্বীপে এবং মূল ভূখণ্ডের তাকাসাকিইয়ামা অঞ্চলের বাঁদরের দলও তাদের মিষ্টি আলু ধোয়া শুরু করে দিয়েছে।

এই গবেষণামূলক ব্যবহারিক বিজ্ঞানের পরীক্ষার নীতিকথা হচ্ছে এই যে, কোনও তাৎপর্যপূর্ণ সংখ্যক ব্যক্তি যদি কোনও বিষয় সম্বন্ধে সচেতন হন তবে এই নূতন সচেতনতা মানুষের অন্তরে অন্তরে সঞ্চারিত হয়। এই তাৎপর্যপূর্ণ সংখ্যাটা (ইংরেজিতে যাকে critical number বলে, আর বাংলায় চরম সংখ্যা) বিভিন্ন বিষয়ে বিভিন্ন রকম হতে পারে। কিন্তু এই শততম মর্কট কাহিনীর অর্থ হচ্ছে এই যে, সামান্য সংখ্যক লোক যদি কোনও বিষয়ে জ্ঞানলাভ করেন তবে তা তাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। কিন্তু এই সময় এমন একটা পরিস্থিতির উদ্ভব হয় যখন কেবলমাত্র আর একজন ব্যক্তি এই নূতন জ্ঞান সম্বন্ধে সচেতন হলেই বিষয়টির শক্তি এত বেশি বৃদ্ধি পায় যে, অচিরে তা সকলের মনের মধ্যেই সঞ্চারিত হয়।

পৃথিবীকে পারমাণবিক যুদ্ধের হাত থেকে রক্ষা করবার জন্য আপনার সচেতনতা অবশ্য প্রয়োজনীয়। আপনিই 'শততম মর্কট' হতে পারেন, পারমাণবিক (সংকট) মুক্ত পৃথিবী (nuclear free world) সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে আপনার মধ্যে সংযোজিত চেতনাশক্তিই সকলেই অন্তরে সঞ্চারিত হবার স্তরে আনতে পারে।

### তিন

প্রেসিডেন্ট আইজেনহাওয়ারের একজন মন্ত্রণাদাতা জর্জ কিস্তিয়াকাওস্কি এক সময় ম্যানহাটান প্রোজেক্টে (এটি পারমাণবিক অস্ত্র নির্মাণের পরিকল্পনার গোপন নাম) কাজ করেছিলেন। তিনি বলেছেন, ''আমি এখন যা জানি তা যদি আগে জানতাম তাহলে এই বোমা তৈরির বিষয়ে কিছুতেই সাহায্য করতাম না।''

গত চল্লিশ বছর ধরে আমাদের পৃথিবীতে প্রায় অবিশ্বাস্য শক্তিসম্পন্ন যে পারমাণবিক দৈত্য আমরা সৃষ্টি করে এসেছি তার দিকে তাকানো যাক। সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স এজেন্সির গবেষণা বিভাগের প্রাক্তন ডেপুটি ডাইরেক্টর হারবার্ট স্কোভিল, জুনিয়ার সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন, ''দুর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতি হচ্ছে এই যে, আজ আমরা এমন পথে চলেছি যার ফলে প্রকৃতপক্ষে একটি পারমাণবিক যুদ্ধের আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। কোনও পারমাণবিক অস্ত্র কেউ সংঘর্ষের সময় অথবা হয়তো অসাবধানতাবশত প্রয়োগ করতে পারে।'

যদি কোনও পারমাণবিক যুদ্ধ শুরু হয় তবে সে যুদ্ধে যে পক্ষই জয় লাভ করুক সে জয় একেবারেই শূন্যগর্ভ হয়ে দাঁড়াবে। কারণ, এ-যুদ্ধে যারা জয়ী হবে তাদের অবস্থা কোনওভাবেই পরাজিতের চেয়ে ভালো হবে না। একটি সর্বাত্মক পারমাণবিক যুদ্ধ লক্ষ লক্ষ বছর ধরে আমাদের এই গ্রহকে জীবনধারণের অনুপযোগী করে তুলতে পারে। আমরা যেভাবে জীবনযাপন করি পারমাণবিক যুদ্ধে তার পরিসমাপ্তি ঘটবে। প্রকৃতপক্ষে এই যুদ্ধে কোনও জয় নেই, কেবল পরাজয়ই আছে। ফলে জয় আর পরাজয় সমার্থক হয়ে দাঁড়াবে। এই পারমাণবিক উন্মত্ততাকে যুদ্ধ বললেও খুব সামান্যই বলা হবে।

যদি আমরা আমাদের বর্তমান পথ থেকে সরে না আসি তবে কী ভয়ংকর বিপদ আমরা ডেকে আনব সে বিষয়ে কতগুলি বৈজ্ঞানিক তথ্য আমাদের সাবধান করে দিচ্ছে। অথচ সেগুলি খুব সহজেই অগ্রাহ্য করে আসা হচ্ছে।

1970 সালে কলোরাডো স্টেটের গ্র্যান্ড জংশনে একজন শিশু-চিকিৎসক লক্ষ্য করলেন চেরা তালু, চেরা ঠোঁট (চলতি

ভাষায় আমরা একে গন্নাকাটা বলি) এবং জন্মকালীন অন্যান্য বিকলাঙ্গতার সংখ্যা বেড়ে গেছে। এখানকার অধিবাসীরা একটা ইউরেনিয়াম পরিশোধনাগারের কারখানায় ব্যবহার করা পাথর এবং বালি দিয়ে তাদের বাড়িগুলি তৈরি করেছিল। ঘটনাটা অনুসন্ধান করবার জন্য কলোরাডো ইউনিভার্সিটি মেডিকেল সেন্টার কেন্দ্রীয় গভর্নমেন্ট থেকে একটা মোটা টাকার গ্র্যান্ট পেয়েছিল, কিন্তু একবছর বাদে সেই গ্র্যান্টের টাকা বন্ধ করে দেওয়া হয়।

যেসব নাভাহো (Navajo–স্প্যানিশ ভাষায় 'j'-র উচ্চারণ আমাদের 'হ'-এর মতো) ইন্ডিয়ান অ্যারিজোনায় ইউরেনিয়ামের খনিতে কাজ করত তাদের অনেকেই ফুসফুসের ক্যানসারে মারা গেছে এবং এখনও যাচ্ছে। এই রোগটা আগে এদের মধ্যে ছিল না বললেই চলে। ড. জোরাল্ড বাকার একটি সাম্প্রতিক সমীক্ষায় প্রকাশ করেছেন যে, নাভাহো ইউরেনিয়াম খনি শ্রমিকদের ফুসফুসে ক্যানসারের সম্ভাবনা 85% বেড়ে গেছে।

নিউক্লিয়ার রেগুলেটরি কমিশনের রবার্ট মাইনেগু এবং কার্ল গোলার 1978 সালের 11 সেপ্টেম্বর একটি যুক্ত বিবৃতি দিয়েছিলেন—''তেজস্ক্রিয় বিকিরণের পরিবেশে যখন কর্মীদের কাজ করতে হয়, দেখা গেছে, সেই পরিবেশের উপযোগী সঠিক কোনও নিরাপত্তার মাত্রা নেই। অর্থাৎ এমন কোনও মাত্রা নেই যাকে বলা যায় সম্পূর্ণ নিরাপদ। বিকিরণের যে কোনও মাত্রা স্বাস্থ্যহানিকর; ক্যান্সারের আশঙ্কা সেখানে উঁকি দেয়।"

চল্লিশ এবং পঞ্চাশের দশকে যখন পারমাণবিক শক্তির 'মধুচন্দ্রিমা দশক' চলেছিল, তখন মানুষের স্বাস্থ্যের ওপর এর ক্ষতিকর প্রভাব দশ হাজার ভাগ কমিয়ে বলা হয়েছে। যত সামান্যই হোক, এই বিকিরণের প্রভাবই মানুষের শরীরে ক্রমসঞ্চীয়মান প্রতিক্রিয়া ঘটায়। আর সারা জীবন ধরে এই সঞ্চয়ের মাত্রা ক্রমেই বাড়তে থাকে।

নিউ হ্যাম্পশায়ার স্টেটের অন্তর্গত পোর্টসমাউথের পারমাণবিক শক্তি পরিচালিত সাবমেরিনের কর্মীদের মধ্যে ক্যানসার হবার সম্ভাবনা সাধারণ মানুষের তুলনায় দ্বিগুণ বলে জানা গেছে। *নিউক্লিয়ার ম্যাডনেস* গ্রন্থের লেখিকা ড. হেলেন ক্যালডিকট্-কে সেখানকার কর্মীদের একটা সভায় বক্তৃতা দেবার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। দেখা গেল উপস্থিত শ্রোতার সংখ্যা মাত্র চারজন! তারা তাঁকে বলে যে, নৌসেনা বিভাগ ফতোয়া দিয়েছে যে, যারা তাঁর বক্তৃতা শুনতে যাবে তাদের চাকরি যাবে। হায়, জীবনের চেয়েও চাকরির মূল্য যে বেশি!

1980 সালের নভেম্বর মাসে একদল চিকিৎসক এবং বিজ্ঞানী বার্কলের ক্যালিফোর্নিয়া ইউনিভার্সিটিতে একটি আলোচনা সভা আহ্বান করেছিলেন। সেখানে ম্যাসাচুসেট্স্ ইনস্টিটিউট অব টেকনলজির পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক ড. কোস্টা সিপিস যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন তার সারমর্ম নিচে দেওয়া হলো—

''আমাদের পৃথিবী একটি ওজোনের" পাতলা স্তর দিয়ে ঘেরা। সূর্যের আলট্রাভায়োলেট রশ্মির একটা বড় অংশই এটি শুষে নেয়। এই রশ্মি চর্ম প্রদাহের সৃষ্টি করে। তাছাড়াও এই রশ্মির মধ্যে বেশিক্ষণ অনাবৃত থাকলে চোখ অন্ধ হয়ে যায়। আমরা এবং পৃথিবীর অন্যান্য যে সব চক্ষুষ্মান প্রাণী আছে, তাদের পক্ষে একান্তভাবে এই ওজোন স্তরের জন্যই চক্ষুষ্মান থাকা সম্ভাবপর হয়েছে।

''পরমাণবিক অস্ত্রের বিস্ফোরণের ফলে প্রচুর পরিমাণ নাইট্রোজেন অক্সাইডের সৃষ্টি হয়ে ওপরের দিকে উঠে ওজোনের স্তরে গিয়ে হাজির হয়।... ওজোনের সঙ্গে এই বিষাক্ত গ্যাসের একটা অতি জটিল রাসায়নিক প্রক্রিয়া দীর্ঘকাল চলতে থাকে। ফলে ওজোনের স্তরের অত্যন্ত ক্ষতি হয়। ন্যাশনাল অ্যাকাডেমি অব সায়েন্স হিসেব করে দেখেছিল যে, 1985 সাল পর্যন্ত সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যে পরিমাণ পারমাণবিক অস্ত্রের উৎপাদন হবে, সামান্য সময়ের মধ্যে যদি তার অর্ধেকের বিস্ফোরণ ঘটে তবে যে পরিমাণ নাইট্রোজেন অক্সাইডের সৃষ্টি হবে তা উত্তর গোলার্ধের 50-70% এবং দক্ষিণ গোলার্ধের 30-40% ওজোনের স্তর নষ্ট করে দেবে। সব বিস্ফোরণ উত্তর গোলার্ধে হবে ধরে নিয়ে এই হিসাব।

''বৈজ্ঞানিক গবেষণাগারের শেষ কথা হচ্ছে ওজোনের স্তরের 20% নষ্ট হয়ে গেলে সমস্ত অরক্ষিত চোখগুলি নষ্ট করে দেবার মতো যথেষ্ট পরিমাণ আলট্রা ভায়োলেট রশ্মি পৃথিবীতে এসে হাজির হবে! (চোখ রক্ষা করবার জন্য! আমরা মানুষেরা চশমা পরতে পারি, কিন্তু অন্যান্য জীব তথা পশুপক্ষীদের চশমা পরা সম্ভব নয়, কাজেই তারা সকলে অন্ধ হয়ে শেষ পরিণতি মৃত্যুকে বরণ করবে। এটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় ইকোলজিক্যাল বা পরিবেশগত সর্বনাশ যা মনুষ্যকল্পনাআয়ত্ত; (এর ফলে) সমস্ত 'ইকো সিস্টেম' সমূলে বিনষ্ট হয়ে যাবে। কীট-পতঙ্গগুলি বিলুপ্তি হয়ে গেলে ফুলে গর্ভাধানের অভাবে আমরা কোনও ফল পাব না।... সমস্ত জীবজগৎই ধ্বংস হয়ে যাবে।..."

যখন পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণ ঘটবে আপনি যদি তার কাছে থাকেন তবে এই সর্বাত্মক পরিবেশ দূষণ নিয়ে

আপনাকে আর মাথা ঘামাতে হবে না। বিস্ফোরণ স্থানের কয়েক মাইলের মধ্যে আপনি যদি থাকেন তবে সঙ্গে সঙ্গেই আপনি পুড়ে ছাই হয়ে যাবেন। কিন্তু আপনি যদি বেঁচে যান তবে ভবিষ্যৎ আপনাকে কী প্রতিশ্রুতি দেবে?

সোজাসুজি বা বিস্ফোরণের পরবর্তীকালে বাতাসের সঙ্গে ভেসে আসা তেজস্ক্রিয় ধূলির (fall out) মাধ্যমে 400 আর.ই.এম. মাত্রার এই মারাত্মক বিকিরণ দুসপ্তাহের মধ্যে আপনার মৃত্যু ঘটাতে পারে। আপনার চুলগুলি খসে পড়বে, সর্বাঙ্গে বড় বড় ক্ষত দেখা দেবে, উদারাময় হয়ে আপনি বমি করতে থাকবেন এবং আপনার রক্তের শ্বেতকণিকা আর অনুচক্রিকা (Platelet—রক্তের বিশেষ উপাদান যা রক্তকে জমাট বাঁধতে সাহায্য করে) তাদের কার্যকরী ক্ষমতা হারানোর জন্য সংক্রামক রোগে অথবা অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের ফলে আপনার মৃত্যু ঘটবে। আমাদের পাড়ার ডাকসাইটে কুঁদুলে বুড়ি ক্ষান্ত পিসি ঝগড়ার সময় তার প্রতিপক্ষকে যে ভাষায় চরম অভিশাপ দিতেন, এই রোগের লক্ষণগুলি তা থেকে খুব একটা আলাদা হবে না।

যদি আর একটু কম তেজস্ক্রিয় বিকিরণে আপনি উন্মোচিত (exposed) হন তবে পাঁচ বছরের মধ্যে আপনার লিউকোমিয়া বা ব্লাড্ ক্যান্সার হবার আশঙ্কা থাকছে। পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণের পরেও হিরোশিমায় যাঁরা বেঁচেছিলেন, সাধারণ মানুষের তুলনায় তাদের মধ্যে এই মারাত্মক প্রাদুর্ভাব ত্রিশ গুণ বেশি বলে দেখা গেছে। আর এই বোমা বিস্ফোরণের জন্য যারা দায়ী, ভাগ্যের নির্মম পরিহাস থেকে তারাও মুক্তি পায়নি। আমেরিকার নেভাদা রাষ্ট্রে যেখানে পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণ শক্তির পরীক্ষা করা হয়েছিল, 1945 সাল থেকে 1965 সাল পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে যে কয়েক লক্ষ সৈন্যকে সেই অঞ্চল দিয়ে মার্চ করে যেতে হয়েছিল, দেখা গেছে তাদের মধ্যে জাতীয় গড়ের তুলনায় লিউকোমিয়া রোগ চারশো গুণ বেশি।

সামান্য পরিমাণ উন্মোচনের (exposure) বারো বছর বা তার বেশি সময়ের মধ্যে আপনাকে ক্যান্সার রোগাক্রান্ত করতে পারে। প্লুটোনিয়ামের একটি অদৃশ্য কণিকা এত বেশি তেজস্ক্রিয় যে, এতে শুধু ক্যান্সারই নয়, আপনার জিনেরও এমন পরিবর্তন ঘটাতে পারে যে, আপনার ভবিষ্যৎ বংশধর জন্মাবধি হবে বিকলাঙ্গ। (gene হচ্ছে ক্রোমোজোমের একটি রাসায়নিক উপাদান, যার মাধ্যমে বংশানুক্রমিক গুণাবলী ভবিষ্যৎ বংশধরদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়)। বিখ্যাত গবেষক এবং ইউরেনিয়াম-233 এর সহ-আবিষ্কারক ড. জন গফম্যান Radiation and Human Health নামে সুবৃহৎ গ্রন্থে এ-সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

ভূগর্ভের খনি থেকে যে ইউরেনিয়াম পাওয়া যায় বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় তারই রূপান্তরে প্লুটোনিয়াম, স্টনসিয়াম-90, এবং অন্যান্য তেজস্ক্রিয় মৌলিক পদার্থ পাওয়া যায়। অধিকতর শক্তিশালী পারমাণবিক অস্ত্র উৎপাদনে প্লুটোনিয়াম ব্যবহার করা হয়। এর অর্ধজীবন (half life) 24,400 বছর আর পাঁচ লক্ষ বছর পর্যন্ত এর ক্ষতিকর প্রভাব থাকে।

ড. হেলেন ক্যালডিকট্ তাঁর *Nuclear Madness* গ্রন্থে লিখেছেন, ''চিকিৎসক হিসেবে আমি বলতে পারি পারমাণবিক কারিগরি বিদ্যা আমাদের এই গ্রহের জীবন ধ্বংস করার দৃষ্টিকোণ থেকে আশঙ্কাজনক। যদি বর্তমান পরিস্থিতি সমানে চলতে থাকে তবে যে বায়ু আমরা নিশ্বাসে গ্রহণ করি, যে খাদ্য আমরা খাই, যে জল আমরা পান করি, সে সবই শীঘ্রই তেজস্ক্রিয়তায় দূষিত হয়ে এমন বিপদজনক প্রভাব বিস্তার করবে যে, ইতিহাসবর্ণিত সবচেয়ে বড় মহামারী রোগও এর ধারে কাছে যেতে পারবে না। অজ্ঞাতসারে এই তেজস্ক্রিয় বিষে উন্মোচিত হয়ে আমাদের মধ্যে অনেকেই ক্যান্সারে আক্রান্ত হতে যাচ্ছেন। অনেকের জিনের ক্ষতি হয়েছে এবং আমাদের সরকারের পরমাণু ঘেঁষা (pro-nuclear) নীতির যদি আমূল পরিবর্তন না ঘটে তবে আরও অধিক সংখ্যক ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হবেন।''

**চার**

আজ আমরা 'নিউক্লিয়ার সিউয়েজে' ডুবে যেতে বসেছি (Nuclear Sewage, একে Nuclear Waste-ও বলা হয়, পারমাণবিক শক্তি উৎপাদনের পরে বাতিল করে দেওয়া অত্যন্ত তেজস্ক্রিয় আবর্জনা)। আমেরিকায় বর্তমানে (1982 সালের হিসেব) এইরকম দশকোটি গ্যালন বিপদজনক তেজস্ক্রিয় আবর্জনা জমা আছে। এগুলি নিয়ে কী করা হবে তা কেউ জানে না। সমগ্র পৃথিবীতেই এই ক্ষতিকারক পদার্থ বিপদজনক গতিতে বেড়ে চলেছে। পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদন করার ফলে স্বভাবতই ভারতবর্ষেরও একই জটিল সমস্যা। এমন কোনও নিরাপদ পদ্ধতি এখনও আবিষ্কৃত হয়নি যার সহায়তায় ক্ষরণ-নিরোধ বদ্ধ-পাত্রে এই চরম বিপদজনক ক্ষয়কারক তেজস্ক্রিয় আবর্জনাগুলি যুদ্ধ, ভূমিকম্প, বন্যা এবং ঘূর্ণিবাত্যাকে অগ্রাহ্য করে লক্ষ লক্ষ বছর ধরে নিরাপদ পাহারায় থাকবে। আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের নিরাপত্তা এভাবে ধ্বংস করে দেবার কী অধিকার আমাদের আছে!

1946 সাল থেকে 1963 সালের মধ্যে মার্শাল দ্বীপপুঞ্জের চারপাশে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সত্তরটি পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে। এর ফলে প্রত্যেকটি 'ছত্রাক মেঘ' (Mushroom Cloud—পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণের ফলে একটা বিরাট ব্যাঙের ছাতার মতো মেঘ সৃষ্টি হয় বলে এই অদ্ভুত নামকরণ) থেকে কয়েক লক্ষ কোটি প্লুটোনিয়ামের পরমাণু বেরিয়ে এসে সমস্ত পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে। 1970 সালের মধ্যে দেখা গেছে মার্শাল দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসীদের মধ্যে ক্যান্সার, বৃদ্ধিচ্যুতি (retarded growth) এবং স্বতঃস্ফূর্ত গর্ভপাতের প্রাদুর্ভাব ঘটেছে।

ক্ষতির পরিমাণ অবশ্য এখানে শেষ হয়নি। ধরা যাক বাতাসের সঙ্গে ভেসে এসে এর এক কণা প্লুটোনিয়াম লোকালয়ের কাছে এসে পড়ল। সরাসরি তা নিশ্বাসের সঙ্গে কোনও মানুষের শরীরে প্রবেশ না করলেও রেহাই নেই। হয়তো একটা পশু বা পাখি এসে নিশ্বাসের সঙ্গে শরীরে গ্রহণ করেছে। তেজস্ক্রিয় প্রভাবিত কোনও রোগে সে মারা যাবে। তার গলিত দেহ থেকে এই বিষকণিকা আবার বাতাসে ছড়িয়ে পড়বে আর নিশ্বাসের সঙ্গে হয়তো এবার তা মানুষের শরীরে প্রবেশ করতে পারে। মানুষের সৃষ্ট এই প্লুটোনিয়াম (অর্ধজীবন 24,400 বলে সৃষ্টির আদি যুগে প্রাকৃতিক অবস্থায় যে প্লুটোনিয়াম ছিল তা বহু পূর্বেই অন্য মৌলিক পদার্থে রূপান্তরিত হয়েছে) এবার শরীরের কোষের মধ্যে জিন নিয়ন্ত্রিত যে প্রণালী (genetic regulating mechanism) কোষের মধ্যে ক্যানসারের প্রসার রোধ করে। তাকে ধ্বংস করে দিতে পারে। শরীরের মধ্যে তখন ক্যান্সার কোষের সৃষ্টি হতে পারে। শরীর ধ্বংস হয়ে গেলেও সেই প্লুটোনিয়াম কণিকার ধ্বংস হচ্ছে না। আগামী পাঁচ লক্ষ বছর ধরে দেহ থেকে দেহান্তরে গিয়ে জীব-জগতের একই বিপর্যয় ঘটাবে। হয়তো এটি কেবল সম্ভাবনা, একটি ঝুঁকি, তবু আপনার বরাতে এটা যে ঘটবে না, একথা নিশ্চিত করে বলা যায় না।

হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটির বায়োকেমিস্ট্রির অধ্যাপক ড. জন.টি.এডসেল বলেছেন, ''আমরা সকলেই বিশেষ করে উত্তর গোলার্ধের অধিবাসীরা, আমাদের ফুসফুস এবং অন্যান্য আভ্যন্তরিক অঙ্গে কিছু পরিমাণে প্লুটোনিয়াম বহন করে চলেছি।'' আর ডঃ জন গফম্যানের অভিমত হচ্ছে এই যে, ফুসফুসের যে অংশ নিশ্বাস ত্যাগ প্রণালী নিয়ন্ত্রণ করে (clearance mechanism) ধূমপায়ীদের সেই অংশের ক্ষতি হওয়ায় ''প্লুটোনিয়ামের ক্ষতিকর প্রভাব তাদের মধ্যে একশো গুণ বেশি পরিলক্ষিত হয়।''

এই ভয়-জাগানো বিবৃতি দুটির তাৎপর্য যে কী তা লেখা নিষ্প্রয়োজন। তার ওপর ''একা রামে রক্ষা নাই, সুগ্রীব দোসর।'' শুধু প্লুটোনিয়াম নয়, আরও একটি ক্ষতিকর তেজস্ক্রিয় মৌলিক পদার্থ 'স্ট্রনসিয়াম-90'ও পারমাণবিক বিস্ফোরণের ফলে আবহাওয়া দূষিত করে।

কালোরাডো ইউনিভার্সিটি মেডিকেল স্কুলের ড. কার্ল জনসনের অভিমত, ''সাভানা রিভার পারমাণবিক কারখানা''র জন্য ইতিমধ্যে জর্জিয়া এবং সাউথ ক্যারোলিনার এক হাজার বর্গমাইল অঞ্চল প্লুটোনিয়াম দ্বারা দূষিত হয়েছে। 1979 সালে জর্জিয়ার কলম্বিয়া শহরের নিকটবর্তী অঞ্চলে উৎপাদিত শাকসবজির তেজস্ক্রিয় আয়োডিন বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে তা মানুষের 'থায়রয়েড ডোজে'র হিসেবে প্রতি বছর 24,000 মিলিরেমের সমতুল্য। শরীরের আয়োডিন থায়রয়েড গ্ল্যান্ডে জমা হয়ে সেখানে থাইরক্সিন নামে একটা হর্মোনের সৃষ্টি করে। এই থাইরক্সিন বিপাক প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণের জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয়। কাজেই 'তেজস্ক্রিয়' আয়োডিন দ্বারা সৃষ্ট 'তেজস্ক্রিয়' থাইরক্সিন বিপাক প্রক্রিয়ার সমূহ ক্ষতি করবে। 'এনভিরনমেন্টাল প্রোটেকশন এজেন্সি' (সংক্ষেপে E.P.A.—পরিবেশ দূষণ মুক্ত করবার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটা সংস্থা) যে নিরাপদ মাত্রা বেঁধে দিয়েছে এটা তার 320 গুণ বেশি। অবশ্য বিজ্ঞানীরা এই তথাকথিত 'নিরাপদ-মাত্রা'র অস্তিত্ব সম্বন্ধে যে সন্দিহান, তা আগেই বলা হয়েছে।

সাভানা নদী এবং স্থানীয় দুধ ও তরকারির মধ্যে উচ্চ পরিমাণে ট্রিসিয়াম লক্ষ করা গেছে। (tritium—হাইড্রোজেনের একটা তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ)। এই ট্রিসিয়াম নিয়মিত ভাবেই ওই কারখানা থেকে ছাড়া হতো।... 1969 সালে টেনেসির 'ওকরিজ ন্যাশনাল ল্যাবরেটরি'র হেল্থ্ ফিজিক্সের ভূতপূর্ব ডাইরেক্টর ড. কার্ল জেড, মর্গান কারখানার নিকটবর্তী বনের হরিণের মাংস বিশ্লেষণ করে দেখেছেন তার মধ্যে বাৎসরিক 2250 মিলিরেমের সমতুল্য তেজস্ক্রিয় সিজিয়াম পাওয়া গেছে। এটা ই. পি. এ-র নির্দেশিত তথাকথিত নিরাপদ মাত্রার 90 গুণ বেশি।

1975 সালের এক সমীক্ষায় দেখা যায় প্রতিদিন এই রকম দশ হাজার পাউন্ড মারাত্মক রাসায়নিক দ্রব্য পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে ছড়িয়ে পড়ছে। আপনার শরীর সম্ভবত ইতিমধ্যেই এই মৃত্যুদূত বহন করে চলেছে। আমাদের নিশ্চিত হতে হবে যে, আর কোনও বাড়তি মাত্রা যেন আমাদের বহন করতে না হয়। তেজস্ক্রিয় পরমাণু ইতিমধ্যে আমাদের খাবারের মধ্যে

প্রবেশ করেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কৃষিবিভাগ দ্বারা প্রকাশিত *Food, The Year book of Agriculture 1959* গ্রন্থের 118 পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের পরীক্ষামূলক পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণের ফলে সমগ্র পৃথিবী জুড়ে তেজস্ক্রিয় স্ট্রনসিয়াম-90 ছড়িয়ে পড়েছে। 1953 সালে জন্তুদের অস্থি দুগ্ধজাত সামগ্রী এবং মাটিতে এই আবির্ভাবটি প্রথম ধরা পড়ে। বর্তমানে মানুষ যেখানেই বাস করুক এবং তার বয়স যতই হোক, প্রত্যেকের শরীরে এই তেজস্ক্রিয় পদার্থ দেখা যায়। *The Bulletin of Atomic Scientist* (Vol. XVII, No. 3, p. 44, March 1962) জার্নালে প্রকাশিত একটা ভীতিপ্রদ তথ্যে দেখা যায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শিশুদের অস্থিতে তাদের পিতামাতার তুলনায় ছয় থেকে আট গুণ বেশি স্ট্রনসিয়াম-90 দেখা গেছে। ভারতবর্ষে সামগ্রিকভাবে এই ধরনের সমীক্ষা করা হয়েছে কিনা এবং করা হয়ে থাকলেও তার কী রকম ফলাফল দেখা গেছে তা আমার জানা নেই। তবে অনুমান করি, আমাদের অবস্থাও এ থেকে খুব একটা আশাপ্রদ নয়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অ্যাটমিক এনার্জি কমিশন পরিচালিত রকি ফ্লাট্‌স্ প্লুটোনিয়ামের কারখানা থেকে 1957 সালের 11 সেপ্টেম্বর এবং 1969 সালের 11 মে বহির্ক্ষরণ (leak) হবার ফলে কলোরাডোর ডেনভার মেট্রোপলিটান অঞ্চলে পুরুষের মধ্যে 24% আর নারীর মধ্যে 20% ক্যানসারের মাত্রা বেড়ে গেছে।

রাশিয়ায়ও এই ধরনের দুর্ঘটনা ঘটা খুবই স্বাভাবিক। তবে তা জানা শক্ত। তবু অন্তত একটা দুর্ঘটনার খবর পাওয়া গেছে। 1958 সালে রাশিয়ার কাইস্টাইম (Kyshtym)-এ একটা পারমাণবিক শক্তির কারখানায় বিস্ফোরণ হবার ফলে তেজস্ক্রিয় মেঘ ছড়িয়ে পড়ে কয়েকশো মাইল জায়গাকে একেবারে বিধ্বস্ত করে দেয়। শ্মশানভূমিতে পরিণত ইউরাল পর্বতের এই অঞ্চল বর্তমানে কয়েক হাজার বছরের জন্য লোকবসতির অনুপযুক্ত হয়ে গেছে। সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা, মার্কিন গভর্নমেন্ট এই দুর্ঘটনার বিষয়ে সি. আই. এ-র রিপোর্টটি দীর্ঘ কুড়ি বছর ধরে বেমালুম চেপে রেখেছিল। দুর্ঘটনাটা পরম শত্রুর দেশ রাশিয়াতেই হোক না কেন, কিন্তু পারমাণবিক শক্তি উৎপাদনের কারখানার দুর্ঘটনা তো! পাছে এই ঘটনা জানতে পেরে মার্কিন জনসাধারণ পারমাণবিক শক্তি উৎপাদনের বিরুদ্ধে ঘোট পাকায়! কর্তা ব্যক্তিদের সে ভয় তো আছে। 1977 সালের 'ফ্রীডম অব ইনফরমেশন অ্যাক্টে'র দৌলতে তথ্যটা প্রকাশ পায়।

**পাঁচ**

হিরোশিমা এবং নাগাসাকিতে ফেলা পারমাণবিক বোমা দুটো বাদ দিয়ে 1941 সাল থেকে 1945 সাল পর্যন্ত সমগ্র দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে মোট তিন মেগাটনের কিছু বেশি বিস্ফোরক ব্যবহার করা হয়েছিল। আর বর্তমানে 20 মেগাটন শক্তিসম্পন্ন পারমাণবিক বোমা একেবারে সেজেগুজে প্রস্তুত হয়ে বসে আছে। এর একটা ব্যবহার করলেই একটা বড় শহর শুধু পুরোপুরি নিশ্চিহ্নই হয়ে যাবে না, সে জায়গাটি লক্ষ লক্ষ বছরের জন্য বসবাসের অনুপযুক্ত হয়ে দাঁড়াবে। আরো আশার বাণী শোনানো হয়েছে যে, এর চেয়েও বেশি শক্তিশালী পারমাণবিক অস্ত্র প্রস্তুত হবার পথে! এই বইয়েরই এক জায়গায় একটা 24 মেগাটন পারমাণবিক অস্ত্রেরও উল্লেখ আছে।

এই আত্মধ্বংসকারী ক্ষমতা হাতে পাবার জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ উঠে পড়ে লেগে গেছে। এদের অস্ত্র জোগাবার মহান এবং পবিত্র দায়িত্ব যারা নিয়েছে তাদের দলে শুধু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আর সোভিয়েত ইউনিয়নই নয়, সেইসঙ্গে গ্রেট ব্রিটেন, ফ্রান্স, পশ্চিম জার্মানি এবং ইতালিও আছে। এরা মৃত্যুফেরির ভূমিকা নিয়ে প্রতিদিন সাড়ে তিনশো মিলিয়ন ডলারের পারমাণবিক এবং অন্যান্য সাধারণ অস্ত্র পৃথিবীর অন্যান্য দেশে বিক্রি করছে। দশ টাকা হিসাবে ডলার ধরলেও (যদিও বর্তমানে তেরো টাকা ছাড়িয়ে গেছে) প্রতিদিন পৃথিবীতে তিনশো পঞ্চাশ কোটি টাকার অস্ত্র বিক্রয় হচ্ছে। আর এই সমর সম্ভারের প্রধান ক্রেতা হচ্ছে সেইসব গরিব আর অনুন্নত দেশ যারা নিজেরা এই ধরনের আধুনিক সমরাস্ত্র নির্মাণে অক্ষম। স্বভাবতই মনে প্রশ্ন জাগে কেন আমাদের এই সর্বনাশা পরিস্থিতির মধ্যে বাস করতে হবে?

এই মৃত্যুফেরিওয়ালাদের বদান্যতার ফলে ক্রমে ক্রমে পৃথিবীর ছোটো বড় সব দেশেই এই মারাত্মক পারমাণবিক অস্ত্র মজুত হবার আশঙ্কা দেখা দিচ্ছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের Nuclear Regulatory Commission-এর হিসেব অনুযায়ী আট হাজার পাউন্ড ইউরেনিয়াম এবং প্লুটোনিয়ামের কোনও সন্ধানই মিলছে না। যে সব দেশ বা শক্তির হাতে এগুলি গিয়ে পড়েছে, বর্তমান বিজ্ঞান ও কারিগরির যুগে তাদের পক্ষে এই ব্রহ্মাস্ত্র নির্মাণ করাও খুব একটা কঠিন ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে না। এই অস্ত্র প্রতিযোগিতার উন্মত্ততা প্রায় আয়ত্তের বাইরে চলে গেছে। সুপরিকল্পিতভাবে অথবা অসাবধানতার ফলে পারমাণবিক যুদ্ধ বেধে যাওয়া সম্ভব। হয়তো তা আসন্নও। যে কোনও মুহূর্তে তা ঘটতে পারে।

হার্ভার্ডের আইনশাস্ত্রের অধ্যাপক রোজার ফিনারের অভিমত—''পারমাণবিক যুদ্ধ কোনও সমাধানই নয়। যার 'সমাধান' করতে চাওয়া, এটা নিজেই তার চেয়ে বড় সমস্যা।" একটা সর্বাত্মক পারমাণবিক যুদ্ধ কোটি কোটি মানুষকে হত্যা করতে পারে। যারা বেঁচে থাকবে, তেজস্ক্রিয় বিকিরণজনিত অসুস্থতা তাদের ''জেনেটিক ব্লুপ্রিন্টের" অসংখ্য পরিবর্তন (mutation) ঘটাতে পারে। আমাদের এই পারমাণবিক উন্মত্ততা যদি সমানে চলতে থাকে তবে আমাদের প্রপৌত্রেরা এত বেশি বিকলাঙ্গ হয়ে যেতে পারে যে, তারা হয়তো মনুষ্যজাতির অন্তর্গত বলে আর গণ্য হবে না।

ক্যালিফোর্নিয়া ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজির প্রেসিডেন্ট ড. মার্ভিন গোল্ডবার্গার বলেছেন, ''পারমাণবিক অস্ত্র—অস্ত্র নয়—তা হচ্ছে একটা ন্যক্কারজনক ঘৃণ্য জিনিস।" আর হার্ভার্ড মেডিকেল স্কুলের ড. হারবার্ট এল. অ্যাব্রাম্‌স্‌-এর অভিমত হচ্ছে এই যে, ''মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের সম্ভাব্য পারমাণবিক যুদ্ধে যে বিপুল সংখ্যক লোক নিহত হবে তাদের মৃতদেহ পরপর সাজালে পৃথিবী থেকে চাঁদে গিয়ে পৌঁছুবে।" ব্যক্তি বা জাতিবিশেষের কোনও আকাঙ্ক্ষা, তার বিচারে তা যত ন্যায়সঙ্গত, শুভ এবং প্রয়োজনীয়ই হোক না কেন, সমগ্র মানবজাতিকে বলিদান করে তা অর্জন করার মধ্যে কোনওরকম যুক্তিই কি থাকতে পারে?

এম. আই. টি.-র অধ্যাপক এবং *Bulletin of the Atomic Scientists*-এর প্রধান সম্পাদক ড. বার্নার্ড ফেল্ড বলেছেন, ''যুদ্ধ সম্বন্ধে যুদ্ধ বিভাগের যে সব পরিকল্পনা গভীরভাবে আলোচনা করা হচ্ছে তাতে বোঝা যায় এই দশকের শেষ দিকে কোনও পারমাণবিক যুদ্ধ সংঘটিত হলে উভয় পক্ষের প্রত্যেকেই দশ হাজার থেকে কুড়ি হাজার মেগাটনের বোমা সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োগ করতে পারবে।

সে রকম হলে বায়ুমণ্ডল বাহিত তেজস্ক্রিয় ধূলিকণার (fall out) হাত থেকে পৃথিবীর কোনও অঞ্চলই রেহাই পাবে না। এই মারাত্মক ধূলিকণা সমস্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং প্রায় সমস্ত সোভিয়েত ইউনিয়নকেই আবরিত করবে। মাথাপিছু প্রায় কুড়ি মাত্রার তেজস্ক্রিয় রশ্মি পৃথিবীর সব জীবের ভাগে জুটবে।

আমাদের সকলকে বিবেচনা করতে হবে যে, এই পরিস্থিতি সম্পূর্ণ ভাবেই অসহনীয় এবং সেজন্য আমার মনে হয় আমাদের (ভবিষ্যৎ) গতিপথ নির্ধারণের বিষয়ে কোনও মতান্তরই থাকা উচিত নয়। পারমাণবিক নিরস্ত্রীকরণ সম্ভবপর কিনা সেটা আমাদের সমস্যা নয়। (আমাদের সমস্যা হচ্ছে) কী করে আমরা (এ বিষয়ে) আমাদের নেতাদের উপলব্ধি করাতে পারব। স্পষ্টত আমাদের দেশের সকলেই, অন্তত অধিকাংশ লোকই যখন উপলব্ধি করতে পারবেন যে, বর্তমানে যে নীতি অনুসরণ করা হচ্ছে তা সর্বতোভাবেই গ্রহণের অযোগ্য, তখনই নেতারা পথ বদলাতে বাধ্য হবেন। বর্তমান এই নীতির ফলে ক্ষেপণাস্ত্রের (missile) ওপর ক্ষেপণাস্ত্র জমা হচ্ছে, অস্ত্রের ওপর অস্ত্র। আর সেগুলি ব্যবহার করবার নীতির নির্ধারণ কেবলমাত্র উন্মত্ত মহাশক্তিধর রাষ্ট্রগুলি (super powers) মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে তথাকথিত উন্নত-সভ্য দেশগুলির মধ্যেও ছড়িয়ে পড়ছে।

''আমরা নিজেদের কী করে উপলব্ধি করাব যে, এই পথ সহ্যের বাইরে? আমরা যেখানে আছি সেখান থেকে বিপরীত মুখে চলতে হবে; পরিশেষে এই সঞ্চিত অস্ত্রের (stockpiles) পরিমাণটিও কমাতে হবে।"

''ইন্টার হেল্পের" সহস্থাপয়ক ডেভিড হফম্যান বলেছেন, ''পারমাণবিক যুদ্ধে আক্রমণ না করাটাই সবচেয়ে বড় প্রতিরক্ষা।" (The best defence is not to have an offence কথাটা স্পষ্টই প্রচলিত বাণী offence is the best defence-এর সময়োপযোগী পরিবর্তিত রূপ)। বর্তমানে জাতিতে জাতিতে যুদ্ধ কোনও বিবাদেরই মীমাংসা করে না। ঊনবিংশ শতাব্দীতে যেমন দাসত্ব প্রথা বেআইনি করে দেওয়া হয়েছিল, বিংশ শতাব্দীতে তেমনি যুদ্ধকেই বেআইনি বলে ঘোষণা করতে হবে। আমাদের বেঁচে থাকাবার জন্য বর্তমান সভ্যতাকে নতুন পথে চালাবার দাবি জানানো জরুরি।

**ছয়**

পারমাণবিক যুগের আরও একটি মস্ত বড় বিপদ নিয়ে এবার আলোচনা করছি। পারমাণবিক বোমা নয়, সাধারণ বোমাই বর্তমান পরিস্থিতিতে পারমাণবিক বোমার ভূমিকা নিতে পারে। কথাটা অদ্ভুত শোনালেও সত্যি।

পারমাণবিক শক্তি উৎপাদনের কারখানায় জ্বালানি হিসাবে যে 'রিঅ্যাকটর রড' বা 'ফুয়েল বান্ড্‌ল' (সাধারণ ইউরেনিয়াম বা তার বিকল্প কোনও তেজস্ক্রিয় ধাতু দ্বারা নির্মিত) ব্যবহার করা হয়, একটা সাধারণ বোমা তাকে ধ্বংস করে দিতে পারে। তার ফলে চারপাশে তেজস্ক্রিয় বিকিরণ ছড়িয়ে পড়বে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় যদি ইউরোপে পারমাণবিক শক্তি উৎপাদনের কারখানা থাকত, তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বোমায় সেগুলি ধ্বংস হয়ে সমস্ত মহাদেশ জুড়েই মৃত্যুর তাণ্ডব নৃত্য জাগিয়ে তুলতে পারত। আর বাতাস জল ও খাদ্য তেজস্ক্রিয় বিকিরণে বিষাক্ত হয়ে হাজার হাজার বছর ধরে গোটা মহাদেশটাই বসবাসের অযোগ্য হয়ে পড়ত।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অ্যাটমিক এনার্জি কমিশনের 1964 সালের একটা সমীক্ষায় বলা হয়েছে এই ধরনের একটি গুরুতর পারমাণবিক দুর্ঘটনায় পঁয়তাল্লিশ হাজার লোক নিহত, এক লক্ষ লোক আহত এবং গোটা পেনসিলভেনিয়া (লোকসংখ্যার হিসেবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তৃতীয় বৃহত্তম স্টেট) অঞ্চলের মতো জায়গা জুড়ে বিষাক্ত হতে পারে। পারমাণবিক বোমা হাতে না পেলেও পারমাণবিক শক্তির কারখানা ধ্বংসমূলক হিংস্র কার্যে অভ্যস্ত সন্ত্রাসবাদীদের আওতার বাইরে নয়—এটা ভাগ্যের একটা মস্ত বড় পরিহাস।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অবসরপ্রাপ্ত রিয়ার অ্যাডমিরাল জিন আর লারোকি-র অভিমত হলো, যান্ত্রিক গোলাযোগ অথবা ভারপ্রাপ্ত কর্মীদের ভুলেও পারমাণবিক যুদ্ধ শুরু হতে পারে। তিনি বলেছেন, ''আমাদের যুদ্ধের বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ (strategic) একটা সাবমেরিন, জর্জ ওয়াশিংটন, কয়েকমাস আগে একটা জাপানি জাহাজের সঙ্গে ধাক্কা লেগে ডুবে যায়। ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপের জন্য সবচেয়ে ভালো সাবমেরিনের মধ্যে এটি একটি। পারমাণবিক আক্রমণের জন্য দুটো সাবমেরিন, স্করপিওন এবং থ্রেশার আমরা হারিয়েছি। কী করে সেগুলি জলে ডুবে গেল আজ পর্যন্ত আমরা তা জানি না। একজন (কর্মরত) মেকানিক (হঠাৎ) একটা রেঞ্চ ফেলে দিয়েছিল যার ফলে এই বছরের প্রথম দিকে আরকানসাসে একটা ক্ষেপণাস্ত্র হঠাৎ ছুটে যায়।... পারমাণবিক অস্ত্র এরোপ্লেন থেকে হঠাৎ পড়ে যাওয়ার একাধিক নজির আছে। বোমা ফেলার জায়গা দিয়ে সেগুলি স্রেফ পড়ে গেছে। তবে কয়েক বছর আগে একটা বোমারু বিমান থেকে যেটা ক্যারোলিনায় পড়ে গিয়েছিল সেটাই সবচেয়ে বিপজ্জনক; ওখানকার একটা জলাভূমির মধ্যে সেটা পড়েছিল। এবং সেই পারমাণবিক অস্ত্র সমস্ত জায়গা জুড়ে তন্ন তন্ন করে খোঁজা হয়। তবু আজ পর্যন্ত আমরা সেটা খুঁজে পাইনি।...''

এই বিপজ্জনক কাহিনীর শেষ পর্বে দেখা যায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা বিভাগ গোটা জলাভূমিটা কিনে নিয়ে তার চারপাশ ঘিরে একটা বেড়া তুলে দিয়েছে। কাজেই জায়গাটা পারমাণবিক তেজস্ক্রিয়ার বিপদ থেকে মুক্ত হয়ে গেল! এই চমকপ্রদ ঘটনাগুলি জানা গেছে Physicians for Social Responsibility এবং Council for a Livable World-এর যুক্ত আহ্বানে; 1981 সালের 31 অক্টোবর লস এঞ্জেলসে যে আলোচনা সভা বসেছিল সেখানে পঠিত ভাষণ থেকে।

এই ধরনের যেসব বিপজ্জনক দুর্ঘটনা ঘটেছে, তার সবগুলিই লোক সমক্ষে প্রকাশিত না হলেও কিছু কিছু হয়েছে। আরও গোটাকয়েক নজির দিচ্ছি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রাক্তন সেক্রেটারি অব ডিফেন্স, রবার্ট ম্যাক্‌নামারার সহকারী ড্যানিয়েন এল্‌বার্গ (‘পেন্টাগন পেপার’ খ্যাত—তবে তা এ প্রসঙ্গের বাইরে) জানিয়েছেন 1961 সালে মার্কিন বিমান বাহিনীর একটা এরোপ্লেন 24 মেগাটনের একটা পারমাণবিক বোমা বয়ে নিয়ে যাবার সময় পথে দুর্ঘটনায় ভেঙে পড়ে। ঘটনাটা ঘটেছিল নর্থ ক্যারোলিনায়। ছ'টা পরস্পর সংবদ্ধ নিরাপত্তা প্রক্রিয়ার (Interlinking Safety Mechanism) মধ্যে পাঁচটাই এই দুর্ঘটনার ফলে নষ্ট হয়ে যায়। নাগাসাকিতে যে বোমাটা ফেলা হয়েছিল তার এক হাজার গুণ বেশি শক্তিশালী এই পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণটা কেবলমাত্র অবশিষ্ট একটি সুইচের জন্যই হতে পারেনি। ভাগ্য ভালো বলতে হবে!

আরও দৃষ্টান্ত চান? সোভিয়েত ইউনিয়নের একটা এরোপ্লেন পারমাণবিক অস্ত্র নিয়ে যাবার পথে জাপানের সমুদ্রে ভেঙে পড়ে। ওটা কোনও দেশের মাটির ওপর পড়লে কী সর্বনাশটাই না হতো! পারমাণবিক ক্ষেপণাস্ত্র নিয়ে যাবার সময় একাধিক আমেরিকান সাবমেরিন রাশিয়ার জাহাজের সঙ্গে ধাক্কা খেয়েছে। আর একবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ‘ভুল করে’ স্পেনের ওপর চারটে প্লুটোনিয়াম বোমা ফেলে দিয়েছিল। কী করে এরকম মারাত্মক ভুল হয় তা বোঝা মুশকিল। সৌভাগ্যক্রমে সেগুলির বিস্ফোরণ ঘটেনি; ঘটলে কর্তৃপক্ষ নিশ্চয়ই বলতেন, ''ওহোঃ, দুঃখিত।''

### সাত

সাধারণ বোমার হাত থেকে বেসামরিক জনসাধারণের নিরাপত্তার ব্যবস্থা এই শতাব্দীর প্রথম দিকে কার্যকরী হতো। কিন্তু ক্ষেপণাস্ত্র ছোঁড়ার পরে যে ত্রিশ মিনিটেরও কম সময় হাতে পাওয়া যায় (স্বভাবতই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের সম্ভাব্য পারমাণবিক যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে) তাতে সে নিরাপত্তা ব্যবস্থার মূল্য কতটুকু! পারমাণবিক ক্ষেপণাস্ত্রের আগুনের ঝড় মাটির নিচের সব আশ্রয়স্থল শ্মশানের চুল্লিতে পরিণত করে ফেলবে। কাজেই বর্তমানে নিরাপত্তা ব্যবস্থা অকেজো এবং একেবারেই ব্যর্থ। পারমাণবিক অস্ত্র এতই সর্বাত্মকভাবে বিধ্বংসী যে, 1980 সালের নভেম্বর মাসে ‘চিকিৎসকের সামাজিক দায়িত্ব’ বিষয়ে একটি আলোচনা সভায় ড. জ্যাক গাইনার বলেছেন—''এটা আমার বিশ্বাস, কোনও চিকিৎসক পারমাণবিক আক্রমণের ফলে উদ্ভূত জরুরি অবস্থায় চিকিৎসার বিষয়ে কোনও পরিকল্পনায়ও যদি যোগদান করেন তবে তিনি নৈতিক বিচার বুদ্ধির গুরুতর বিরুদ্ধাচরণ করবেন (committing a

profoundly unethical act), কারণ তিনি নিজের সহকর্মীদের তথা সমগ্র জনসাধারণের মধ্যে এই ভ্রান্ত ধারণাই জাগিয়ে তুলবেন যে, বিশেষ সামাজিক অর্থে এই পরিত্রাণ পদ্ধতি সম্ভবপর।"

বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক অ্যালবার্ট আইনস্টাইন সতর্কবাণী উচ্চারণ করে বলেছেন, ''পৃথিবীর জনসাধারণ এবং বিশেষ করে তাদের সরকারকে এই অভূতপূর্ব ধ্বংসের বিষয়ে সচেতন করে দেবার প্রচেষ্টার কোনও শৈথিল্যই আমরা প্রদর্শন করব না, যদি পরস্পরের প্রতি তাদের মনোভাব ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তাদের ধারণার আমূল পরিবর্তন না ঘটে তবে নিশ্চিতভাবেই তারা এই ধ্বংসকে ডেকে আনবে।"

ভবিষ্যৎ প্রলয়ের যে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দেখা দিয়েছে তা অগ্রাহ্য করে কেন আমরা পৃথিবী থেকে নিজেদের চিরতরে বিলুপ্ত করে দেব? কর্নেল ইউনিভার্সিটির জ্যোতির্বিজ্ঞানের অধ্যাপক এবং 'কসমস' সিরিজের স্রষ্টা ড. কার্ল সাগান বলেছেন, ''চারশো কোটি বছরের জটিল বিবর্তনবাদের সৃষ্ট শ্রেষ্ঠ জীব যদি আত্মধ্বংসের উপায় আবিষ্কার করে তা কত বড় অপব্যয়! আমরাই প্রথম প্রজাতি যারা এই উপায় উদ্ভাবন করেছি। পারমাণবিক যুদ্ধ এড়াবার চেয়ে বড় বিষয়বস্তু আর নেই। এটা বিশ্বাসের একান্তভাবেই অযোগ্য যে, কোনও চিন্তাশীল ব্যক্তি এই বিষয়ে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হবেন না।... জীবিত থাকবার এবং চিন্তা করবার অধিকার আমাদের আছে।"

পারমাণবিক ক্ষেপণাস্ত্রের গতি উভয়মুখী। কী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আর কী সোভিয়েত ইউনিয়ন কোনও দেশই কিছু বেশি নিরাপত্তা অর্জন করে অন্য দেশের নিরাপত্তা কমাতে পারে না। পারমাণবিক অস্ত্র আর আমাদের নিরাপত্তা এনে দিতে সক্ষম নয়। স্পষ্টতই আমাদের একটা বেছে নিতে হবে—হয় পারমাণবিক অস্ত্র বর্জিত ভবিষ্যৎ অথবা মানব-ভবিষ্যৎ বর্জিত পৃথিবী!

সামরিক শক্তির চেয়ে আমাদের জীবনের মূল্য অনেক বেশি। আমরা কি এতই উন্মত্ত যে জাতিতে জাতিতে পরস্পর-বিরোধী মতবাদের জন্য আমরা সমস্ত পৃথিবীকে ধ্বংস করে দেব? অ্যাডাম থেকে অ্যাটমই কি মানুষের অদৃষ্টের চরম পরিণতি? আমরা চতুর্দিকে যে বার্তা পাচ্ছি তা সরব এবং সুস্পষ্ট। ''সাধারণ এবং সম্পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণ—পারমাণবিক অস্ত্রের সামগ্রিক সমীক্ষা" বিষয়ক প্রতিবেদনে 1980 সালের 12 সেপ্টেম্বর জাতিসঙ্ঘের সেক্রেটারি জেনারেল বলেছেন, ''মানব সভ্যতার ধ্বংসের বিপদটিকে কোনও তাত্ত্বিক বিতর্কবিষয়রূপে গণ্য না করে পৃথিবীর সাম্প্রতিক বিপদজনক পরিস্থিতি সম্বন্ধে সাধারণ সচেতনতা সৃষ্টি করার জন্য তা ব্যবহার করা উচিত, যাতে রাজনৈতিক ইচ্ছা (শক্তি) প্রয়োগে একটি গ্রহণযোগ্য সমাধান খুঁজে পাওয়া যায়।" এ-বিষয়ে কম্যুনিটি চার্চ অব সিনসিনাটির রেভারেন্ড মরিস্ ম্যাকক্র্যাফিনের অভিমত,—''পারমাণবিক অস্ত্র নিরোধের সর্বতোভাবে অগ্রাধিকারযোগ্য বিষয়টি সাধারণ মানুষের সামগ্রিক চেতনা অথবা বিবেকের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়নি।... কেবল সীমাবদ্ধ নয়, পারমাণবিক অস্ত্র একেবারে বাতিল করে দিতে হবে (nuclear arms must not just be limited, they must be eliminated.)"

সোভিয়েত ইউনিয়নে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত এবং আই.বি.এম.-এর প্রেসিডেন্ট টমাস জে. ওয়াটসন, জুনিয়র বলেছেন, ''অতীতের যুদ্ধ পরিকল্পনার সমস্ত পদ্ধতিই বর্তমানে বাতিল হয়ে গেছে। এখন আক্রমণ মানেই আত্মহত্যা।"

ভারতবর্ষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত এবং হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক সুপণ্ডিত ড. জন কেনেথ গলব্রেথ 1981 সালের 31 অক্টোবর 'সামাজিক দায়িত্বে চিকিৎসকের ভূমিকা' বিষয়ক আলোচনা সভায় 2700 অংশগ্রহণকারীর সম্মুখে বলেছিলেন—''(পারমাণবিক) অস্ত্র সীমিতকরণের বিষয়ে ওয়াশিংটনে যাঁরা (অর্থাৎ রাজনৈতিক নেতারা) সক্রিয় এবং সবল ভূমিকা গ্রহণ করেননি, তাঁদের তিরস্কার করার চেয়ে প্রয়োজনীয় বিষয় আর কী থাকতে পারে?"

ডোয়াইট ডি. আইজেনহাওয়ার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে পঞ্চতারকাযুক্ত সেনানায়ক ছিলেন এবং পরবর্তীকালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টও হয়েছিলেন। তিনি নিজের সম্বন্ধে বলেছেন—''(আমি) যুদ্ধের বীভৎসতা এবং দীর্ঘস্থায়ী বিষাদের সাক্ষী, (আমার) এ উপলব্ধি আছে যে, হাজার হাজার বছর ধরে ধীরে ধীরে এবং পরিশ্রম করে গড়ে তোলা এই সভ্যতা আর একটি (মাত্র) যুদ্ধে সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়ে যেতে পারে।"

1953 সালে আইজেনহাওয়ার বলেছেন—''প্রত্যেকটি বন্দুক যা নির্মাণ করা হয়েছে, প্রত্যেকটি যুদ্ধজাহাজ যা জলে ভাসানো হয়েছে, প্রত্যেকটি রকেট যা নিক্ষেপ করা হয়েছে, সেগুলি, যারা ক্ষুধার্ত অথচ খাদ্য পায়নি, যারা শীতার্ত অথচ পরিধেয় বস্ত্র পায়নি তাদের বঞ্চিত করে করা হয়েছে। (মূল বিবৃতিতে অবশ্য theft শব্দটা ব্যবহার করা হয়েছে)। রণসজ্জায় সজ্জিত পৃথিবী শুধু অর্থব্যয় করছে না, তার শ্রমিকদের ঘর্ম, তার বিজ্ঞানীদের প্রতিভা, তার সন্তানদের বাসস্থান (অপ) ব্যয় করেছে।"

1959 সালে এই রাজনীতিজ্ঞ সেনাপতি আবার বলেছেন—''আমি বিশ্বাস করতে চাই ভবিষ্যতে সরকারের চেয়েও জনসাধারণ শান্তি স্থাপনের ব্যাপারে অধিকতর সক্রিয় হবে। প্রকৃতপক্ষে আমি মনে করি, কোনও একদিন জনসাধারণ এত বেশি শান্তিকামী হবে যে, তাদের শান্তি পাবার পথে সরকার আর বাধা হয়ে দাঁড়াবে না।''

1962 সালে বিখ্যাত পরমাণু বিজ্ঞানী ড. লিও জ্বিলার্ড (Szilard) Council for a Livable World নামে একটি সংস্থা স্থাপন করেন। পারমাণবিক যুদ্ধ বন্ধ এবং অস্ত্রের সীমিতকরণ বিষয়ে এই সংস্থা সক্রিয়ভাবে সংগ্রাম করে আসছে। এই উদ্দেশ্যসাধনের জন্য এই সংস্থা বৈজ্ঞানিক প্রতিভার সঙ্গে ব্যবহারিক রাজনীতির মিশ্রণ ঘটিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সিনেটরদের বৈদেশিক নীতির বিষয়ে প্রভাবিত করবার প্রচেষ্টা চালিয়ে আসছে। এই সংস্থার মতে সঞ্চিত অস্ত্রের সম্ভার যদি কোনওদিন ব্যবহার নাও করা হয়, তবু সমরসজ্জার এই বিরাট অপব্যয় মানুষের জীবনে ধ্বংসাত্মক প্রভাব এনে দিচ্ছে। একটা অত্যন্ত চাঞ্চল্যকর তথ্য হচ্ছে এই যে, পৃথিবীতে প্রতি মিনিটে অস্ত্রের পেছনে খরচ হয় এক মিলিয়ন ডলার অর্থাৎ 13 টাকা ডলার হিসেবে। 1কোটি 30 লক্ষ টাকা। যদি অস্ত্রের পেছনে এই বিরাট অপব্যয় না করা হতো, তবে পৃথিবীর সমস্ত রকম সমস্যা খুব সহজেই দূর করা যেত। তৃতীয় বিশ্বে (অর্থাৎ আমাদের মতো নির্জোট গরিব দেশে) শুধু 1980 সালেই 18 বিলিয়ন ডলারের (অর্থাৎ 23,400 কোটি টাকার) অস্ত্র কেনা হয়েছে। এটা 1975 সালের তুলনায় 8 বিলিয়ন ডলার বেশি। এই তথ্যগুলি পড়ে স্বভাবতই মনে প্রশ্ন জাগে এই অস্ত্রেই কি আমাদের পেট ভরবে?

**আট**

পৃথিবীর পারমাণবিক দূষণ সমস্যা সমাধানের একমাত্র উপায় পৃথিবীর জনসাধারণকে তথ্য সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং অন্যান্য দেশের অধিবাসীদের পারমাণবিক ধ্বংসের বিপদ সম্বন্ধে সচেতন করা দরকার। যখন পৃথিবীর সমস্ত মানুষই এই তথ্যগুলি জানতে পারবে তখন এই পারমাণবিক ধ্বংসের সীমানায় তারা বাস করতে রাজি হবে না। বর্তমান পরিস্থিতি এতই বিপজ্জনক যে, আমাদের সাধারণ চিন্তাধারা ছেঁটে ফেলে সবকিছুর ঊর্ধ্বে মানবতা ও পৃথিবীর শান্তি স্থাপনের চিন্তাধারাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

পারমাণবিক প্রলয়ের পথে আমাদের এই সর্বনাশা যাত্রা বন্ধ করে দেবার জন্য ব্যক্তিগতভাবে আমাদের প্রত্যেককে সক্রিয়ভাবে সচেষ্ট হতে হবে। ডেল ব্রিডেনবাফ, রিচার্ড হার্ভার্ড এবং গ্রেগরি মাইনর জেনারেল ইলেকট্রিক কোম্পানির নিউক্লিয়ার ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে খুব উঁচু মাইনের চাকরি থেকে 1976 সালের 2 ফেব্রুয়ারি পদত্যাগ করেন। পারমাণবিক শক্তির যুক্ত কমিটিতে তাঁরা বিবৃতি দিয়েছেন—''যখন আমরা জেনারেল ইলেকট্রিক (কোম্পানির) পারমাণবিক শক্তি বিভাগে প্রথম কাজে যোগদান করি, এই নতুন কারিগরি বিদ্যা আর পারমাণবিক শক্তির বিষয়ে অত্যন্ত উৎসাহিত ছিলাম। (আমাদের কাছে) প্রতিশ্রুতি ছিল (এই পারমাণবিক শক্তি) বর্তমান কালের এবং ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য নিরাপদ, নির্মল এবং সুলভ (বিদ্যুৎ) শক্তির অফুরন্ত উৎস হবে।... কিন্তু এই প্রতিশ্রুতি এখনও প্রতিপালিত হয়নি। পারমাণবিক শিল্প সংকীর্ণমনা বিশেষজ্ঞদের শিল্প হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রত্যেকে এই কারিগরি বিদ্যার একটি ক্ষুদ্র অংশের উন্নতি এবং পরিশোধন করে চলেছে। কিন্তু সমগ্রভাবে সমস্ত পৃথিবীর ওপর এর প্রভাব বিষয়ে কোনও চিন্তাই করছে না।... পরমাণু বিভাজিত শক্তি, যা এত বেশি বিপজ্জনক যে, বর্তমানে এই গ্রহের জীবজগতের অস্তিত্বই বিপদসঙ্কুল করে তুলেছে। তার ক্রমোন্নয়ন এবং বিস্তৃতির জন্য আমাদের সমগ্র জীবনশক্তিকে নিয়োজিত করবার আর কোনও সার্থকতাই খুঁজে পাচ্ছি না।''

সুধী পাঠক-পাঠিকারা লক্ষ করে দেখবেন, যে সর্বনাশা ক্ষতিকর প্রভাবের কথা এখানে বর্ণনা করা হয়েছে, তা কিন্তু পারমাণবিক অস্ত্রের বিষয়ে নয়, পরমাণু বিভাজনজনিত বিদ্যুৎ শক্তির বিষয়ে। আমাদের দেশের যে নেতারা পারমাণবিক অস্ত্রের বিরুদ্ধে জেহাদ করেছেন, তারাই আবার পারমাণবিক শক্তি উৎপাদনের জন্য উদ্যোগী হয়ে মহাশক্তিধর রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে তাল মিলিয়ে "Atom for Peace" বলে ঊর্ধ্ববাহু হয়ে নৃত্য করছেন। পারমাণবিক শক্তি উৎপাদনের বিরুদ্ধে কোনও সোচ্চার প্রতিবাদ এখনও আমাদের দেশে শুরু হয়েছে বলে জানা নেই। এই ধরনের কারখানাগুলি তেজস্ক্রিয় বিকিরণ দ্বার কীভাবে পরিবেশকে দূষিত করতে পারে এবং জনসাধারণের ওপর তার সর্বনাশা ভয়ঙ্কর প্রভাব কীভাবে বিস্তার করতে পারে তা আগে আলোচনা করা হয়েছে।

ড. হেলেন ক্যালডিকট তাঁর *Nuclear Madness* গ্রন্থে মনে করিয়ে দিয়েছেন, ''উদ্‌বুদ্ধ জনতার শক্তি অপরাজেয়।'' ভিয়েতনাম এবং ওয়াটার গেট (যে কেলেঙ্কারির ফলে মার্কিন প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিকসন পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন) তা প্রমাণ করেছে। সে শক্তি আবার দেখাতে হবে। এখনও খুব দেরি হয়ে যায়নি। কারণ যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ। নৈরাশ্যের কোনও হেতু নেই, কারণ ইতিমধ্যে অনেক বড়

বাধা অতিক্রান্ত হতে দেখেছি। আমাদের ভয় করার হেতুও নেই, আমরা গণতন্ত্রকে কার্যকরী হতে দেখেছি।"

সম্মিলিত গণমতকে কার্যকরী হতে দেখা গেছে। 1977 সালের জুন মাসে অস্ট্রেলিয়ায় আশি হাজার লোক মার্চ করে দাবি জানিয়েছিল মাটির নিচে যে ইউরেনিয়াম আছে তা সেখানেই থাক। এই প্রতিবাদ সাফল্য অর্জন করেছিল। পশ্চিম জার্মানিতে পারমাণবিক শক্তি ব্যবহারের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদের সম্মুখীন হয়ে সেখানকার চ্যান্সেলার (প্রেসিডেন্টের সম পদমর্যাদাসম্পন্ন) হেলমুট স্মিট বলতে বাধ্য হয়েছিলেন ''জনসাধারণকে কেউ জোর করে পারমাণবিক শক্তি গিলিয়ে দিতে পারে না।"।

**নয়**

ভারতবর্ষ 1974 সালের 18 মে সকাল 8টা 5 মিনিটে রাজস্থানের মরুভূমিতে মাটির অভ্যন্তরে তার প্রথম (এবং এ পর্যন্ত শেষ) পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণ ঘটিয়ে এই দানবিক অস্ত্রের অধিকারী হিসেবে পৃথিবীর ষষ্ঠ জাতির 'মর্যাদা' পেয়েছে। ভারত সরকার থেকে প্রচার করা হয়েছিল ভূগর্ভে এই অস্ত্রের বিস্ফোরণ ঘটনো হয়েছে বলে তেজস্ক্রিয় বিকিরণের হাত থেকে দেশটা সম্পূর্ণ নিরাপদ ছিল। সে সময়ে আমি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্থায়ী বাসিন্দা ছিলাম। *Mother Jones* নামে ওখানকার Establishment বিরোধী একটি মাসিক পত্রে এই নিরাপত্তা সম্বন্ধে প্রশ্ন তুলে একটি সুদীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশিত হতে দেখেছিলাম। আমাদের রাষ্ট্রদূতের অফিস থেকে অবশ্য প্রবন্ধটির একটি দুর্বল প্রতিবাদ প্রকাশ করা হয়েছিল।

ভূগর্ভে পারমাণবিক অস্ত্রের বিস্ফোরণ কতটা নিরাপদ সে-সম্বন্ধে অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তি ইদানীং প্রশ্ন তুলেছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যে স্টেটে সবচেয়ে বেশি ভূগর্ভে পারমাণবিক অস্ত্রের বিস্ফোরণের পরীক্ষা চলে আসছে সেই ওয়াশিংটন (ওদেশের রাজধানী ওয়াশিংটন, ডি.সি. নয়) অবস্থিত মাউন্ট সেন্ট হেলেন নামে একটি সুপ্ত আগ্নেয়গিরি হঠাৎ জেগে উঠে সর্বনাশা লাভা উদ্গীরণ করে সে-দেশের এক শ্রেণীর চিন্তাশীল ব্যক্তির মধ্যে বেশ উদ্বেগের কারণ ঘটিয়েছে। একজন গবেষক বিজ্ঞানী হিসেবে এদের এই উদ্‌বেগকে আমি অযৌক্তিক বলে মনে করি না।

ভারত সরকার থেকে স্বীকার করা হোক আর না হোক আমাদের পারমাণবিক বিস্ফোরণটা ছিল সম্পূর্ণভাবেই রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত—পাকিস্তানকে ভয় দেখানো। কিন্তু সে উদ্দেশ্য সফল হয়নি। লাভের মধ্যে এই হয়েছে এর ফলে পাকিস্তান তার নিজের পারমাণবিক অস্ত্র নির্মাণের বিষয়ে তৎপর হয়েছে।

1961 সালে সুবিখ্যাত রাজনৈতিক বিশ্লেষক জন গান্থার তাঁর *Inside Europe Today* গ্রন্থে (1936 সালে প্রকাশিত *Inside Europe*-এর পুনর্লিখিত সংস্করণ) লিখেছেন। মেগাটন পারমাণবিক বোমা নির্মাণের ফলে 200 মিলিয়ন (অর্থাৎ 20 কোটি) লোকের জীবনহানি হতে পারে। সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জানে তাদের যে কোনও দেশ থেকে ওই সংখ্যক লোক মারা গেলে তাদের দেশ প্রায় জনশূন্য হয়ে পড়বে। কাজেই তারা পারমাণবিক যুদ্ধকে ভয় পায়। কিন্তু ভয় পায় না চীন। কারণ তাদের দেশের 200 মিলিয়ন লোক মারা গেলে তাদের খাদ্য সমস্যার সমাধান হবে।

*গান্থারের মন্তব্যের শেষ অংশটা বক্রোক্তি* হলেও, বর্তমানের রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের অভিমত এ থেকে খুব একটা আলাদা নয়। তাঁদের মতে কোনও মহাশক্তিধর রাষ্ট্রই পারমাণবিক যুদ্ধ চায় না, কারণ এর গুরুত্ব তারা বোঝে। তারা জানে এ যুদ্ধে তাদের উভয়েরই ধ্বংস অনিবার্য। বর্তমানে পারমাণবিক যুদ্ধের আশঙ্কা উন্নয়নশীল দেশগুলি থেকে। তারা অনুমান করে এই ধরনের যুদ্ধ ভারত-পাকিস্তান অথবা আরব-ইস্রায়েলের মধ্যেই হবার সম্ভাবনা। এটা মনে করবার যথেষ্ট সঙ্গত কারণ আছে যে, বর্তমানে ইস্রায়েলের হাতেও পারমাণবিক বোমা আছে। অনেকে মনে করেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে চুরি করা প্লুটোনিয়ামেই (এই চুরির কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে) এই বোমা তৈরি হয়েছে আর চুরির ব্যাপারটা পুরোপুরিই ওদেশের কর্তৃপক্ষের সাজানো। আর লিবিয়ার প্রেসিডেন্ট মুয়াম্মার গদ্দাফির অর্থ সাহায্যে (তাছাড়া যুদ্ধের খাতে আমেরিকা থেকেও কম অর্থ সাহায্য আসেনি) পাকিস্তানের 'ইসলামিক বোমা' নির্মাণের পথে অবশ্যই যদি ইতিমধ্যেই তা নির্মিত না হয়ে থাকে।

তবে অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, কোনও দেশের জনমত এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে রাজনৈতিক মতবাদ অত্যন্ত চঞ্চল; আর সেজন্যই রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের বিশ্লেষণ বার বার মিথ্যো বলে প্রমাণিত হয়েছে। একসময়ে তাঁরা মনে করতেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভবিষ্যতে সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে হাত মিলিয়ে চীনের সম্প্রসারণবাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে। কিন্তু সাম্প্রতিক ইতিহাসে সেই ভবিষ্যদ্বাণী হাস্যকর বলে প্রমাণিত হয়েছে। কাজেই সম্ভাব্য পারমাণবিক যুদ্ধের বিষয়ে এদের বিশ্লেষণ ব্যর্থ হলেও আশ্চর্যের কিছু নেই।

আশঙ্কার কথা হচ্ছে, ইদানীং এই বিষয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনমতে পরিবর্তনের সূচনা দেখা দিয়েছে। এই চঞ্চল জনমতকে কীভাবে সুকৌশলে নিয়ন্ত্রিত করে নিজেদের স্বার্থে লাগানো যেতে পারে এস্টাব্লিশমেন্টের সুচতুর কর্তাব্যক্তিরা তা ভালোভাবেই জানেন। জানি না এই পরিবর্তন কোন্ অশুভ ইঙ্গিত বহন করছে।

প্রেসিডেন্ট আইজেনহাওয়ার থেকে প্রেসিডেন্ট কার্টার পর্যন্ত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর (অর্থাৎ পারমাণবিক অস্ত্রের যুদ্ধের) সব মার্কিন প্রেসিডেন্টই বিশ্বাস করতেন যে, পারমাণবিক যুদ্ধে কোনও জাতিই জয়লাভ করতে পারে না।

আমাদের পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণের প্রসঙ্গে *টাইমস্* সাপ্তাহিক পত্রে প্রকাশিত একটি অপমানজনক মন্তব্যের কথা এখানে উল্লেখ না করে পারছি না—ভারতবর্ষের মতো গরিব দেশে পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণ সম্বন্ধে গবেষণা না করে তার উচিত গরুর গাড়ির চাকা কী করে আরও ভালোভাবে চলে সে সম্বন্ধে গবেষণা করা। কথাটা গায়ে জ্বালা ধরানো হলেও মূলে কিছুটা সত্য আছে। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের অতি প্রয়োজনীয় দ্রব্যের দিকেই সরকারের সর্বাগ্রে দৃষ্টি দেওয়া কর্তব্য। আর সে কর্তব্যের কতখানি আজ পর্যন্ত পালন করা হয়েছে, সে প্রশ্ন স্বভাবতই মনে আসে।

আমাদের প্রধানমন্ত্রী এবং ক্ষমতাসীন অন্যান্য নেতৃবৃন্দ আমাদের ভরসা দিয়েছেন শান্তির জন্যই পারমাণবিক শক্তির প্রয়োগ করা হবে। যুদ্ধের জন্য নয়। খুবই আনন্দের কথা। কিন্তু যে কোনও সুগৃহিণীই জানেন বাড়ির চারপাশে ধুলো জমে থাকলে ঘরগুলো কোনোভাবেই ধূলিমুক্ত করা যায় না। বাতাসের সঙ্গে বাইরে থেকে ধুলো উড়ে এসে ঘরগুলি নোংরা করবেই। পারমাণবিক বিস্ফোরণ সৃষ্ট তেজস্ক্রিয় ধুলো সম্বন্ধেও ঠিক একই কথা খাটে। কাজেই শুধু নিজেদের পারমাণবিক অস্ত্র নির্মাণ এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষা বন্ধ করাই যথেষ্ট নয়। আমাদের নিরাপত্তার জন্যই বাইরের চারপাশ পরিষ্কার করার দায়িত্বও আমাদের ওপরই বর্তায়। নয়াদিল্লির এই উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক এ বিষয়ে একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপের সূচনা করেছে।

**দশ**

কিন্তু নয়াদিল্লির এই প্রশংসনীয় উদ্যোগের পরেও আমাদের সরকারের শান্তির জন্য পারমাণবিক শক্তির নীতির বিষয়ে মনের মধ্যে একটা প্রশ্ন থেকে যায়। শান্তির জন্য পারমাণবিক শক্তির ব্যবহার কতটা শান্তি আনবে? এই আশা যে পুরোপুরিই ব্যর্থ হয়েছে, তা আজ স্বীকৃত সত্য। আজকের দিনে Atom for Peace একটি সুপরিচিত শ্লোগান। কিন্তু এই শান্তির জন্য পারমাণবিক শক্তির ব্যবহারের বিরুদ্ধে নয়াদিল্লির বৈঠকে উচ্চবাচ্য করা হয়নি। আর তা হবেই বা কী করে? এই সম্মেলনের আহ্বায়ক আমরা নিজেরাই তো পরমাণু বিভাজিত বিদ্যুৎশক্তির মুখাপেক্ষী হতে চলেছি।

পারমাণবিক শক্তি উৎপাদনের কারখানা থেকে তেজস্ক্রিয় বিকিরণের ফলে জল, বায়ু, খাদ্য সমেত সমগ্র পরিবেশ দূষণের সৃষ্টি আর তেজস্ক্রিয় আবর্জনা নিরাপদে অপসারণ করার গভীর সমস্যা সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা পূর্বেই করা হয়েছে। আর যান্ত্রিক গোলাযোগের জন্য কোনও দুর্ঘটনা বা যুদ্ধের ফলে পারমাণবিক চুল্লির যন্ত্রাংশের ক্ষতি হলে কী মারাত্মক প্রভাবের সৃষ্টি হতে পারে তাও বলা হয়েছে। শান্তির জন্য পারমাণবিক শক্তি ব্যবহার করার জন্য ভারতবর্ষ ইদানীং এই তিনটি গভীর সমস্যারই সম্মুখীন হয়েছে। রাজস্থানের কোটায় যে পারমাণবিক বিদ্যুতের কারখানা স্থাপন করা হয়েছে তা পাকিস্তান সীমান্ত থেকে খুব একটা দূরে নয়। তাছাড়া দুরপাল্লার বোমারু বিমান অথবা ক্ষেপণাস্ত্রের হাত থেকে পৃথিবীর কোনও পারমাণবিক শক্তির কারখানাই আজ আর নিরাপদ নয়।

একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র পাকিস্তানের সঙ্গে আজও আমাদের পুরোপুরি বন্ধুত্বের সম্পর্ক স্থাপিত হয়নি। ভবিষ্যতের কোনও সম্ভাব্য যুদ্ধে তাদের বোমারু বিমানের আওতার মধ্যে আমাদের পারমাণবিক শক্তির কারখানাগুলি এলে তার কী ফল হবে তা সহজেই অনুমান করা যায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'পোষ্যপুত্র' ইস্রায়েল আরব-ইস্রায়েলের যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে নিরপেক্ষ দেশ ইরাকের পারমাণবিক শক্তির কারখানা কীভাবে ধ্বংস করে দিয়েছিল তা আমরা ভুলিনি। এর ফলে তেজস্ক্রিয় বিকিরণে যে পরিবেশ দূষণের সৃষ্টি হয়েছিল সে-সম্বন্ধে কোনও বিস্তারিত আলোচনা কোনও মার্কিন সংবাদপত্রে হয়েছিল কিনা জানি না, আর হয়ে থাকলেও নজরে পড়ার মতো নয়।

পেনসিলভেনিয়ার রাজধানী হ্যারিসবার্গের সন্নিকটে Three Miles Island-এ অবস্থিত পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের কারখানার দুর্ঘটনা ওদেশের উচ্চতর কারিগরি বিদ্যার জন্য শেষ মুহূর্তে গোটা স্টেটকে শ্মশানে পরিণত হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করতে পেরেছিল। কিন্তু ভূপালের কীটনাশক ওষুধের কারখানার দুর্ঘটনা আমরা রোধ করতে পারিনি। ওটা যদি কোনও পারমাণবিক শক্তি উৎপাদনের কারখানা হতো, তবে তার ধ্বংসাত্মক প্রভাব যে কী মহাপ্রলয়ের

সৃষ্টি করতে পারত, তা কল্পনা করলেও আতঙ্কে গা হিম হয়ে আসে। সেক্ষেত্রে শুধু ভূপাল নয়, ঘনবসতিপূর্ণ ভারতবর্ষের অনেকাংশেই এর ধ্বংসাত্মক প্রভাব ছড়িয়ে পড়ত।

কেবলমাত্র Three Miles Island-ই নয়, শেষপর্যন্ত রোধ-করা আরও একটি মারাত্মক দুর্ঘটনার কথা *We Almost Lost Detroit* গ্রন্থে পাওয়া যায়। এই ধরনের কোনও-ক্রমে রক্ষা পাওয়া দুর্ঘটনার খবর যেখানে চেপে যাওয়া সম্ভবপর তা তো আমরা জানতেই পারি না।

তাছাড়া পারমাণবিক শক্তি উৎপাদনের কারখানায় কর্তৃপক্ষের ঔদাসীন্যে, অক্ষমতায় অথবা অর্থব্যয়ের অনিচ্ছায় সবসময় কর্মীদের তেজস্ক্রিয় বিকিরণের হাত থেকে সম্পূর্ণ নিরাপত্তার ব্যবস্থা যে অবলম্বন করা হয় না সে-সম্বন্ধে ওদেশে যথেষ্ট নজির আছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের কারখানাগুলি সবই প্রাইভেট সেক্টরের অন্তর্গত, আমাদের দেশের মতো পাবলিক সেক্টরে নয়। কাজেই ওখানে আর্থিক লাভ লোকসানের প্রশ্নের গুরুত্ব আমাদের দেশের তুলনায় অনেক বেশি। সেজন্য ওদেশের পারমাণবিক শক্তি উৎপাদনের কারখানার কর্তৃপক্ষ সাধারণত এইসব ত্রুটি-বিচ্যুতি গোপন করতে চায় এবং প্রকাশের কোনও সম্ভাবনা দেখলেই তা নিষ্ঠুর হাতে দমন করার চেষ্টা করে। ক্যারেন সিল্কউড নামে একজন পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের কারখানার কর্মী এ-বিষয়ে সমস্ত রকম সাক্ষ্যপ্রমাণ সংগ্রহ করে একজন সাংবাদিকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যাবার পথে অত্যন্ত রহস্যজনকভাবে একটা পথ দুর্ঘটনায় শোচনীয়ভাবে নিহত হন। ঘটনাটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বেশ সাড়া তুলেছিল। এ-সম্বন্ধে বাস্তব ভিত্তিতে লেখা *Who Killed Karen Silkwood?* বইখানা best seller-এর মর্যাদা পেয়েছিল। তাছাড়া এই ঘটনা নিয়ে পরবর্তীকালে *সিল্কউড* নামে একটা চাঞ্চল্যকর সিনেমাও তোলা হয়েছিল। নয়াদিল্লিতে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত চলচ্চিত্র উৎসবে (1985) দেখাবার জন্য সিনেমাটা এদেশে আনা হয়েছিল। জানি না পাঠকরা কেউ ওটা দেখার সুযোগ পেয়েছিলেন কিনা।

পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের চালু কারখানাগুলি বন্ধ করে দেবার এবং নূতন কোনও কারখানা স্থাপনের বিরুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জনসাধারণের দাবি ইদানীং সোচ্চার হয়ে উঠেছে। ওদেশে আমি দীর্ঘ কুড়ি বছর কাটিয়েছি। কাজেই ওদেশের জনসাধারণের সুখ-দুঃখের সঙ্গে আপনা হতেই কিছুটা জড়িয়ে পড়েছিলাম। ওখানে যে হাসপাতালের গবেষণাগারের সঙ্গে আমি যুক্ত ছিলাম তার 25 মাইল দূরে একটি নূতন পারমাণবিক শক্তির কারখানা স্থাপন করতে গিয়ে জনসাধারণের প্রবল দাবির সম্মুখীন হয়ে কর্তৃপক্ষ শেষ পর্যন্ত নতি স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিলেন। স্বভাবতই সে দাবির সঙ্গে আমিও কণ্ঠ মিলিয়েছিলাম। আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে এই যে, উচ্চতর কারিগরি বিদ্যায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারতবর্ষের তুলনায় অনেক বেশি এগিয়ে থেকেও পারমাণবিক কারখানার তেজস্ক্রিয় আবর্জনা অপসারণের সর্বতোভাবে নিরাপদ কোনও পন্থা আজও বার করতে পারেনি। কাজেই এ সমস্যা আমরা কী করে সমাধান করব?

**এগারো**

এই বিরাট সমস্যার সমাধান কোথায়? যে যুগে Industrialistation আর Civilization সমার্থক হয়ে দাঁড়িয়েছে, সে যুগে সমস্ত রকম কল-কারখানা বন্ধ করে দিয়ে back to the nature নিশ্চয়ই একমাত্র সমাধানের পন্থা নয়। কিন্তু আমাদের দেশের পারমাণবিক শক্তির কারখানাগুলি বন্ধ করে দিলে কি সভ্যতার অগ্রগমনের পথে অপূরণীয় ক্ষতি হবে? সরকার বলবে ''নিশ্চয়ই হবে''। কিন্তু আমাদের সম্মিলিত সোচ্চার দাবির জোরে আমরা কি সরকারের নীতি পরিবর্তন করতে বাধ্য করতে পারি না? নিশ্চয়ই পারি। কিন্তু সেটা কী করে সম্ভবপর?

ওদেশে থাকতে দেখেছি সরকারের যে কোনও 'ইস্যু'র বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে কোনও অঞ্চলের অধিবাসী স্থানীয় সিনেটার বা কংগ্রেসম্যানের কাছে চিঠি লেখে। তাতে অনেক সময় কাজও হয়। কারণ তাঁদের ভয় আছে ভোটারদের চটালে পরের বার তাঁর আর ভোট পাবেন না। এ দেশে সে-চেষ্টা করে লাভ নেই। কারণ এখানে এম. পি. বা এম. এল. এ. দের কোনও স্বতন্ত্র সত্তা নেই। তাঁরা পার্টির 'রাবার স্ট্যাম্প' মাত্র। ওদেশে তা নয়। যে কোনও 'ইস্যু' নিয়ে তাঁরা যে কোনও পক্ষে ভোট দিতে পারেন। 'ওয়াটার গেট' কেলেঙ্কারির পরিপ্রেক্ষিতে প্রেসিডেন্ট নিকসনের নিজের দলের সভ্যেরা তাঁর বিরুদ্ধে ভোট না দিলে দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যার জোরে তাঁকে 'ইমপিচ' করা সম্ভবপর হতো না। এজন্য পার্টি থেকে তথাকথিত 'পার্টিদ্রোহী'দের বিরুদ্ধে কোনও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেবার কথা কেউ কল্পনাও করতে পারে না ওদেশে।

এদেশে পার্টির নীতির বিরুদ্ধে ভোট দেবার সম্ভাবনা যাও ছিটেফোঁটা ছিল, দলত্যাগরূপ গর্হিত কর্ম বন্ধ করবার পবিত্র প্রচেষ্টার অজুহাতে তাও বর্তমান সরকার সম্প্রতি আইন প্রবর্তন করে বন্ধ করে দিয়েছে। পার্টির কোনও

সদস্যই আর পার্টির কোনও নীতির বিরুদ্ধাচরণ করতে পারবেন না, আর এখানে পার্টি মানেই তো পার্টি High Command। কংগ্রেস ভাগাভাগি হবার প্রাক্কালে কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী নীলম্ সঞ্জীব রেড্ডিকে পরাজিত করবার জন্য প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী যখন ভি. ভি. গিরিকে নির্দল প্রার্থী হিসেবে দাঁড় করিয়ে তাঁর অনুচরদের 'বিবেক অনুসরণ করে ভোট' দেবার ধুয়ো তুলেছিলেন, ভাগ্যিস তখন সে আইনটা ছিল না। তাই পার্টির বিরুদ্ধে তিনি যেতে পেরেছিলেন।

কাজেই বোঝা যাচ্ছে, 'শান্তির জন্য পরমাণু ব্যবহার'-এর নীতি থেকে সরে আসতে বাধ্য করতে হলে দেশব্যাপী আন্দোলন করে সরকারকে নতি স্বীকার করাতে হবে। ব্যক্তিগতভাবে কোনও এম.পি. বা এম.এল.এ. এই বিষয় সম্বন্ধে যাই মনে করুন না কেন, তাতে পার্টি কিংবা সরকারের কিছুই আসে যায় না। কারণ 'বেআইনি আইন'টা তো পার্টির পক্ষেই। তাই এখন এঁদের পক্ষে 'বিবেক অনুসরণ করে ভোট' দেওয়ার আর সম্ভবপর নয়। কাজটা যত দুঃসাধ্যই হোক, অসাধ্য নিশ্চয়ই নয়। বিশেষ করে এর সঙ্গে যখন সমগ্র জাতির জীবন মরণের প্রশ্ন জড়িত।

পারমাণবিক শক্তি উৎপাদনের কারখানাগুলি বন্ধ করে দিয়ে তার পরিবর্তে শক্তি উৎপাদনের কোনও নিরাপদ, কার্যক্ষম এবং সুলভ বিকল্প পন্থা উদ্ভাবনের ভার আমরা আমাদের দেশের বৈজ্ঞানিকদের ওপর ছেড়ে দিতে পারি। মানুষ যে সমস্যার সৃষ্টি করেছে, সে সমস্যা সমাধানের ক্ষমতাও নিশ্চয়ই এই মানুষেরই আছে। আমাদের এই কথা মনে করে অগ্রসর হতে হবে যে, জীবজগৎহীন পৃথিবীর তুলনায় পারমাণবিক শক্তিহীন পৃথিবী সর্বতোভাবে বাঞ্ছনীয়। আমাদের শরীরের যে অপূরণীয় ক্ষতি ইতিমধ্যে হয়েছে, সেই ক্ষতির মাত্রা বাড়িয়ে আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের মধ্যে যেন তা সঞ্চার না করি। এই পারমাণবিক উন্মত্ততা নাটকের যবনিকা অচিরেই টেনে দিতে হবে।

এই পবিত্র দায়িত্ব পালনের ভার আমার, আপনার এবং সকলের ওপর। মূল গ্রন্থের লেখকের সঙ্গে গলা মিলিয়ে আমি আমার প্রত্যেক পাঠক-পাঠিকার কাছে ঐকান্তিক আবেদন জানাচ্ছি, ''আমার, আপনার, আমাদের অনাগত বংশধরদের তথা গোটা পৃথিবীর ভবিষ্যৎ একমাত্র আমার-আপনার ওপরেই নির্ভর করছে। আপনি 'শততম মর্কট'-এর ভূমিকা গ্রহণ করুন।''

**উৎস নির্দেশ**

১। Nuclear War-এর আভিধানিক অর্থ যাই হোক আমরা এইভাবেই অনুবাদ করি। আগে atom bomb-এর বাংলা লেখা হতো আণবিক বোমা। কিন্তু পাশ্চাত্য দেশে ইদানীং আরও বিজ্ঞানসম্মত শব্দ nuclear bomb ব্যবহার করা হয় আর আমাদের দেশে পারমাণবিক বোমা। আগের তুলনায় এ শব্দটা বিজ্ঞানসম্মত হলেও, 'কেন্দ্রীয় বোমা' (কারণ, বিভাজনজনিত বিস্ফোরণটা পরমাণুর কেন্দ্রেই হয়ে থাকে) অনুবাদটা অধিকতর বিজ্ঞানসম্মত এবং ভাষাসম্মত হতো। ভুল অর্থ বোঝার আশঙ্কায় সম্ভবত শব্দটা গ্রহণ করা হয়নি।

২। Species-এর বাংলা পরিভাষা করা হয়েছে প্রজাতি। অথচ Nation অর্থে আমরা জাতি শব্দ ব্যবহার করি। এখানে প্রজাতির একটি ক্ষুদ্র অংশ হচ্ছে জাতি। কিন্তু অন্যান্য ক্ষেত্রে, যেমন প্রত্যঙ্গ, প্রশাখা ইত্যাদি শব্দে এর বিপরীতটাই দেখা যায়। ভাষাবিদেরা এই অসঙ্গতির কথা চিন্তা করে দেখতে পারেন।

৩। Ozone—সাধারণ অক্সিজেনের অণু দুটো পরমাণু দিয়ে গড়া। কিন্তু তিনটি অক্সিজেনের পরমাণু দিয়ে ওজোনের অণু গঠিত হয়েছে। একে রসায়ন শাস্ত্রে allotropic modification বলা হয়। মূল গ্রন্থে এক ভুল করে অক্সিজেনের আইসোটোপ বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

৪। এর কারণ অবশ্য সহজেই অনুমান করা যায়। কারণ উত্তর গোলার্ধের তুলনায় বিষুবরেখার দক্ষিণে অবস্থিত দক্ষিণ গোলার্ধের রাজনৈতিক গুরুত্ব খুব সামান্য।

৫। Ecology শব্দের পরিভাষা চলন্তিকার পরিশিষ্টে দেওয়া হয়েছে বাস্তব্য বিদ্যা। কিন্তু প্রথম শব্দটা যাদের কাছে 'গ্রীক', আশঙ্কা করছি, দ্বিতীয়টা তাদের কাছে 'হিব্রু' হয়ে দাঁড়াতে পারে। বিজ্ঞানের এই শাখায় উদ্ভিদ এবং প্রাণী জগতের ওপর পরিবেশের প্রভাব নিয়ে চর্চা করা হয়। কাজেই শব্দটার অর্থবোধ্য বাংলা করা যেতে পারে পরিবেশ-নির্ভরশীল জীববিদ্যা।

৬। সব তেজস্ক্রিয় মৌলিক পদার্থের পরমাণুই স্বতঃস্ফূর্তভাবে তেজ বিকিরণের পথে কালক্রমে অন্য মৌলিক পদার্থের পরমাণুতে রূপান্তরিত হয়। যে সময়ের মধ্যে মূল সংখ্যক পরমাণুর অর্ধেক পরিমাণ এইভাবে রূপান্তরিত হয়, তাকে সেই পরমাণুর অর্ধজীবন (half life) বলে।

৭। স্ট্রনসিয়াম—স্ট্রনসিয়াম-90-র অর্থ হচ্ছে, স্ট্রনসিয়াম নামে মৌলিক পদার্থের এমন একটা আইসোটোপ, যার পারমাণবিক ওজন 90।

৮। জেনেটিক ব্লুপ্রিন্ট—ক্রোমোজোমের অভ্যন্তরে জিনগুলি যে পরিকল্পিত ছকে সাজানো থাকে—এর মাধ্যমেই বংশানুক্রমকি গুণাগুণ সঞ্চারিত হয়।

৯। ভিডিও টেপে তোলা এই ধরনের নানারকম খেলা হোম কম্পিউটারে দেখা ইদানীং ওদেশের ছেলে-বুড়োদের বাতিকে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। যুদ্ধটা প্রায় সর্বক্ষেত্রেই বহির্জগতের প্রাণীদের সঙ্গে হয়। এতে খুব ক্ষেপণাস্ত্র ছোঁড়ার বাড়াবাড়ি থাকে। এই যুদ্ধে প্রতিপক্ষ অবশ্য দর্শক নিজেই। হোম কম্পিউটারের নানা সুইচ টিপে বহির্জগতের প্রাণীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করা এই খেলার অঙ্গ।

১০। সংস্কৃত-দুহিতা বাংলা আমাদের মাতৃভাষা পরম ঐশ্বর্যশালিনী হলেও মাঝে মাঝে এর দৈন্য ধরা পড়ে। আমাদের ভাষায় art-ও শিল্প আবার industry-ও শিল্প। চারু বা কারু শিল্প, ভারি বা লঘু শিল্প প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগে এই দৈন্যটা পুরোপুরি ঢাকা যায় না। শিল্পাচার্য এবং শিল্পপতি শব্দ দুটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ যদিও একই ধরনের হওয়া উচিত, কিন্তু ব্যবহারিক অর্থের প্রভেদ অনেকখানি। শিল্পাঞ্চল অর্থ সুস্পষ্ট হলেও শিল্পাশ্রমের অর্থ বড় গোলমেলে। ভাষাবিদেরা শব্দটির অপূর্ণতার বিষয়ে একটু সচেতন হয়ে এর কোনও প্রতিবিধান করতে পারলে ভালো হয়।

১১। Gallup Poll—ড. গ্যালাপ প্রবর্তিত জনমত সমীক্ষার পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে দেশের সর্বস্তরের জনসাধারণের মধ্য থেকে সংগ্রহ করা বহু সংখ্যক ব্যক্তির কাছে কোনও বিষয়ের ওপর তাদের মতামত জেনে নিয়ে সামগ্রিকভাবে জনমত নির্ধারণ করা হয়।

১২। The Establishment—ক্যাপিটাল E দিয়ে আরম্ভ এই শব্দটির অর্থ সীমিত সংখ্যক ব্যক্তি দ্বারা পরিচালিত শক্তিশালী সংস্থা যা সমাজকে প্রভাবাধীন করে রেখেছে। তথাকথিত সমাজবাদী গণতান্ত্রিক গভর্নমেন্টগুলিও প্রায় ক্ষেত্রেই এদের আওতার মধ্যে।

১৩। প্রাথমিক নির্বাচন (primary election)—ওদেশের আসল নির্বাচনের আগে প্রাথমিক নির্বাচনে স্থির করা কোন্ পার্টি থেকে কোন্ প্রার্থী নির্বাচনে দাঁড়াবেন। আমাদের দেশের মতো ব্যক্তিবিশেষের খেয়ালখুশি অনুযায়ী রুদ্ধদ্বারে বৈঠকে প্রার্থী স্থির করা যায় না।

১৪। অনুসন্ধিৎসু পাঠক-পাঠিকারা লক্ষ করবেন আমার এই প্রবন্ধে ১৯৮৫ সালের শেষ ভাগে অনুষ্ঠিত জেনেভা শীর্ষ বৈঠক অথবা সাম্প্রতিক কালের রিকইয়াভিক শীর্ষ বৈঠক সম্বন্ধে কোনও আলোচনা করা হয়নি। তেমনি এতে কোনও আলোচনা নেই। বর্তমানে বহু আলোচিত তথাকথিত 'নক্ষত্র যুদ্ধ' (Strategic Defence Initiatie বা সংক্ষেপে SDI) অথবা সোভিয়েত ইউনিয়নের চের্নোবিল পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ভয়াবহ দুর্ঘটনা সম্বন্ধে।

পরিশেষে একটি ব্যক্তিগত ক্ষোভের কথা নিবেদন করছি। চের্নোবিলের দুর্ঘটনা ঘটবার আগে যদি প্রবন্ধটি প্রকাশিত হতো তবে পাঠক-পাঠিকারা হয়তো বলতে পারতেন, ''হ্যাঁ! শর্মা একথা বলেছিল বটে!'' সেই আত্মতৃপ্তি থেকে বঞ্চিত হলাম, এই আর কি!

---

# স্বাধীনতা সংগ্রাম থেকে শ্রেণী সংগ্রামে
## শতবর্ষে—'জীবন্ত কিংবদন্তী' কমরেড সমর মুখার্জী
### বিক্রমজিৎ ভট্টাচার্য

১৯১৩ সালের ৭ই নভেম্বর হাওড়া জেলার পুরাসে মামার বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন কমরেড সমর মুখার্জী। যে মতাদর্শের জন্য জীবনের পুরোটাই তিনি উৎসর্গ করেছেন। সেই মতাদর্শের সার্থক রূপায়নের দিনটিতেই তার জন্ম।

শৈশবকালেই তাঁর পরিবার হাওড়া জেলারই আমতা শহরে চলে আসে। প্রাথমিক শিক্ষার পর তাঁর শিক্ষাজীবন শুরু হয় আমতা পীতাম্বর হাইস্কুলে। স্কুল জীবনেই দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের ছোঁয়া তাকে আলোড়িত করে। পীতাম্বর হাই স্কুলে তিনি গড়ে তোলেন 'ছাত্র সমিতি', একটা হাতে লেখা পত্রিকাও নিয়মিত প্রকাশ করতে থাকেন। সাংগঠনিক নেতৃত্ব দেওয়া তখন থেকেই শুরু।

১৯৩০ সালের মার্চ মাসে গান্ধীজীর নেতৃত্বে আইন অমান্য আন্দোলন শুরু হলে একজন কংগ্রেস কর্মী হিসেবে সমর মুখার্জী সেই আন্দোলনে যোগ দেন। তিনি তখন অষ্টম

শ্রেণীর ছাত্র। তাঁর নেতৃত্বে স্কুলের অন্যান্য ছাত্ররাও মদের দোকানে পিকেটিং করে, বিদেশী কাপড় পুড়িয়ে আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দেয়। পীতাম্বর হাই স্কুলে শুরু হয় ছাত্র ধর্মঘট তাঁরই নেতৃত্বে। দীর্ঘ তিন মাস চলে এই ছাত্র ধর্মঘট। ফলস্বরূপ শাস্তি হিসেবে সমর মুখার্জী স্কুল থেকে বহিস্কৃত হলেন।

১৭ বছরের সমর কিন্তু বিন্দুমাত্র দমে যাননি এই বহিস্কারের সিদ্ধান্তে। সফল ছাত্র ধর্মঘটের পর তিনি তার দাদা ডাঃ বারীন মুখার্জীর সাথে আইন অমান্য আন্দোলনে আরো সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে থাকেন। তারা দুজনে চিকিৎসক ও আইনজীবীদেরও আন্দোলনে সংগঠিত করেন। ব্রিটিশ পুলিশ ১০৭ নং ধারায় মামলা দায়ের করে দুই ভাইকে গ্রেপ্তার করে এবং এক বছরের কারাদন্ড হয়, তাদের নিয়ে আসা হয় প্রেসিডেন্সি জেলে। এটাই সমর মুখার্জীর প্রথম কারাবাস।

জেল থেকে মুক্ত হওয়ার পর প্রখ্যাত বিপ্লবী বিপিন বিহারী গাঙ্গুলীর সহায়তায় কলকাতায় বউবাজার হাই স্কুলে দশম শ্রেণীতে ভর্ত্তি হন সমর মুখার্জী। ম্যাট্রিকুলেশন পাস করে সমর মুখার্জী সিটি কলেজ থেকে বি.এ. পাস করেন এবং ইউনিভার্সিটি ল' কলেজে ভর্ত্তি হন। লেখাপড়ায় বরাবরই খুব ভাল ছাত্র ছিলেন তিনি। বিপ্লবী বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী তাকে 'আমতার ডি ভ্যালেরা' বলে ডাকতেন এবং খুবই স্নেহ করতেন।

১৯৩৩ সালে মাত্র কুড়ি বছর বয়সেই তিনি প্রথমে আমতা কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক ও হাওড়া জেলা কংগ্রেস কমিটির সদস্য হন। কিন্তু গান্ধীজীর নীতির প্রতি তার মোহভঙ্গ হতে শুরু করে তিরিশ দশকের মধ্যভাগ থেকেই। শ্রমিক-কৃষকদের সম্পর্কে কংগ্রেসের আন্দোলনের কোন কর্মসূচী ছিল না। অপরদিকে কমিউনিষ্টরা শ্রমিক-কৃষকদের দাবি-দাওয়ার আন্দোলনকে সংগঠিত করার কাজে এগিয়ে আসতে থাকে। ১৯৩৬ সালে সারা ভারত ছাত্র ফেডারেশন গড়ে ওঠে। সমর মুখার্জী ছাত্র ফেডারেশন হাওড়া শাখার সভাপতি নির্বাচিত হন। এভাবেই তিনি হাওড়ার তৎকালীন কমিউনিষ্ট নেতা শৈলেন মজুমদার, বিভূতি মুখার্জী, অরুন চ্যাটার্জী প্রভৃতির সাথে পরিচিত হয়ে ওঠেন। মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-অধ্যয়ন শুরু করেন। ট্রেড ইউনিয়ন ও কৃষক সংগঠনের কাজে যুক্ত হন। ১৯৪০ সালে তিনি কমিউনিষ্ট পার্টির সদস্যপদ লাভ করেন।

১৯৪০ সালেই কৃষকদের স্বার্থে পাটের দর বেঁধে দেবার দাবিতে আয়োজিত সমাবেশকে বেআইনী ঘোষণা করে সমর মুখার্জীর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারী করে ব্রিটিশ পুলিশ। কলকাতা থেকে মিটিং সেরে ফেরার পথে হাওড়া ব্রিজের ওপর পুলিশের হাতে ধরা পড়েন তিনি। ধরা পড়ার সময় তার হাতে ছিল স্তালিনের লেখা 'দ্বন্দ্বমূলক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদ'। পুলিশ ঐ বই এর বিষয়বস্তু বিন্দুমাত্র বুঝতে না পেরে সেটা বাজেয়াপ্ত করেনি। সমর মুখার্জী ঐ বই নিয়েই হুগলী জেলে স্টাডি ক্লাস করতে শুরু করে দেন। পরে অন্যান্য রাজবন্দীদের অনুরোধে তিনি ঐ জেলে বসেই বইটির বাংলা অনুবাদ করে দেন।

১৯৪১ সালে মুক্তি পাওয়ার পর সমর মুখার্জী হাওড়া শহরে সালকিয়ায় হোসিয়ারি শ্রমিক ইউনিয়নের একটি গোপন আস্তানায় থেকে পার্টিকে গড়ে তোলার কাজে আত্ম নিয়োগ করেন। ঐ সময় পার্টিতে তার ছদ্মনাম ছিল 'মনি'। উল্লেখ্য, 'বকুল' ছদ্মনাম নিয়ে কমঃ জ্যোতি বসু, কমঃ সমর মুখার্জীর সাথে গোপনে দেখা করতেন। ১৯৪২ সালে কমিউনিষ্ট পার্টির হাওড়া জেলা কমিটি গঠিত হয় এবং সমর মুখার্জী হন সম্পাদক। গোটা হাওড়া জেলাতেই জননেতা হিসেবে তিনি জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন। ১৯৪৩ সালে বোম্বাইতে অনুষ্ঠিত কমিউনিষ্ট পার্টির প্রথম কংগ্রেসে প্রতিনিধি হিসেবে যোগ দেন তিনি।

দেশভাগ অনিবার্য হয়ে উঠলে দেশের বিভিন্ন শহরেই মাঝে মাঝেই শুরু হয় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। ১৯৪৬ সালের ১৬ই আগস্ট মুসলিম লিগের ডাকে 'ডাইরেক্ট অ্যাকশন ডে'র দিন দাঙ্গা ঠেকাতে প্রত্যক্ষ ভূমিকা নিয়েছিলেন তিনি এবং এর জন্য তাকে মূল্যও চোকাতে হয়েছিল। প্রথমে হিন্দু দাঙ্গাবাজরা তাকে আক্রমণ করে 'মুসলমানের দালাল' বলে তার মাথা ফাটিয়ে দেয়। ঐ একই দিনে মুসলিম লিগের দাঙ্গাবাজরাও তাকে ছুরি দিয়ে আঘাত করে, সবশেষে নেমে আসে পুলিশের আক্রমন। মৃতপ্রায়, অজ্ঞান অবস্থায় তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরদিন কমঃ মুজাফর আহমদ-এর উদ্যোগে একটি মেডিকেল টিম তার চিকিৎসা ব্যবস্থা দেখাশোনা করতে আসে প্রায় তিন মাস পর তিনি সুস্থ হন এবং কাকাবাবুর অনুরোধে দাঙ্গা প্রতিরোধের সেই বিবরণ 'স্বাধীনতা' পত্রিকায় লেখেন সমর মুখার্জী। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৪৮ সালে কমিউনিস্ট পার্টি বেআইনী ঘোষণা হওয়ায় ভারত রক্ষা আইনে সমর মুখার্জী পুনরায় কারারুদ্ধ হন এবং চার মাস পর মুক্তি পান। এই সময় তিনি আত্মগোপন করে পুলিশের চোখে ফাঁকি দিয়ে নানা বিপদ ও জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সমস্ত জেলায় পার্টি সংগঠন গড়ে তোলেন। গ্রেপ্তার এড়াতে একবার ট্রেন থেকে পড়ে গিয়েও

বিস্ময়কর ভাবে বেঁচে যান, যদিও খবর রটে গিয়েছিল তিনি মারা গেছেন।

১৯৫৩ সালে কমরেড মুখার্জী কমিউনিষ্ট পার্টির রাজ্য পরিষদের সদস্য হন এবং কেন্দ্রীয়ভাবেও পার্টির কাজের দায়িত্ব এসে পড়ে তার ওপর। ১৯৫৭ সালে কেন্দ্রীয় বাস্তুহারা পরিষদের ডাকে উদ্বাস্তু আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়ে তিনি কারারুদ্ধ হন। এই বছরেই বিধানসভা নির্বাচনে উত্তর হাওড়া বিধানসভা কেন্দ্র থেকে তৎকালীন বিধানসভার অধ্যক্ষ ও দুঁদে কংগ্রেস নেতা শৈল মুখার্জীকে পরাজিত করে সমর মুখার্জী বিজয়ী হন। ১৯৫৯ সালে কেন্দ্রীয় বাস্তুহারা পরিষদের (UCRC) সম্পাদক নির্বাচিত হন তিনি, এখনও পর্যন্ত তিনি এই পদে আছেন। তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধান রায় এর কাছে কমরেড মুখার্জী বহুবার উদ্বাস্তু সমস্যাকে জোরালো ভাবে পেশ করেছেন।

১৯৬১ সালে বর্ধমানে অনুষ্ঠিত অবিভক্ত কমিউনিষ্ট পার্টির শেষ রাজ্য সম্মেলনে তিনি রাজ্য সম্পাদকমন্ডলীর সদস্য নির্বাচিত হন। সেই সময় যে আন্তঃপার্টি ও মতাদর্শগত সংগ্রাম চলছিল সেই সংগ্রামে কমরেড মুখার্জী মার্কসবাদের বিশুদ্ধতা রক্ষায় অবিচল থেকে সংশোধনবাদ ও সুবিধাবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেন। ১৯৬২ সালে ভারত-চীন সীমান্ত সংঘর্ষকে কেন্দ্র করে কংগ্রেস সরকার কমিউনিষ্টদের ওপর নির্যাতন নামিয়ে আনে। পার্টির মধ্যে মার্কসবাদী বিপ্লবী অংশের নেতাদের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারি হয়। কাকাবাবুর নির্দেশে কমরেড মুখার্জী গ্রেপ্তার এড়িয়ে থাকেন। ১৯৬২ সালের ২২শে নভেম্বর রাত্রে পুলিশ খবর পেয়ে আমতার বাড়িতে গ্রেপ্তার করতে গেলে কমরেড মুখার্জী পুলিশের চোখকে ফাঁকি দিয়ে বাড়ির পেছনের দরজা দিয়ে পালিয়ে গ্রেপ্তার এড়িয়ে যান এবং আত্মগোপন করেন। পার্টির বিপ্লবী অংশের নেতৃত্বের মধ্যে কমরেড প্রমোদ দাশগুপ্ত, কমরেড জোতি বসু, কমরেড 'কাকাবাবু' মুজাফর আহমেদ সহ বেশীরভাগ নেতা গ্রেপ্তার হয়ে যাওয়ার ফলে সংশোধনবাদী নেতৃত্ব—'স্বাধীনতা' পত্রিকা এবং পাটির রাজ্য পরিষদের দখল নিয়ে নেয়। এই সঙ্কটের মুহূর্তে বিশেষ করে কাকাবাবুর নির্দেশেই সমর মুখার্জীর নেতৃত্বে পার্টির গোপন রাজ্য কমিটি গঠিত হয়। সমর মুখার্জীই হন পার্টির গোপন রাজ্য কমিটির সম্পাদক। আটক পার্টি নেতৃত্বের সাথে গোপন যোগাযোগের মাধ্যমে সমর মুখার্জী তখন রাজ্যব্যাপী বন্দীমুক্তি আন্দোলন এবং পার্টি সংগঠন গড়ে তুলতে থাকেন। গোপন পার্টিতে তাঁর নাম ছিল পৃথ্বীরাজ। পার্টির সংশোধনবাদী নেতৃত্বের বিরুদ্ধে এবং প্রকৃত মার্কসবাদ লেনিনবাদের পতাকাকে উর্দ্ধে তুলে ধরার ক্ষেত্রে কমরেড মুখার্জী এই 'পৃথ্বীরাজ' ছদ্মনাম নিয়েই 'পার্টির সামনে গুরুতর সঙ্কট' শীর্থক নামক একটি রাজনৈতিক দলিল রচনা করেন ১৯৬২ সালে। সেই দলিলটি ভারতের কমিউনিষ্ট আন্দোলনের একটি মাইলফলক হিসেবে চিহ্নিত হয় পরবর্তীকালে এবং আজও 'পৃথ্বিরাজের দলিল' নামে সেটি খ্যাত।

১৯৬৩ সালে পার্টিকে সংশোধনবাদের হাত থেকে মুক্ত করার জন্য প্রয়োজন দেখা দেয় একটি পত্রিকার। হাওড়ার কয়েকজন কমরেড এর উদ্যেগে 'হাওড়া হিতৈষী' নামে একটি পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশ হতে থাকে। সমর মুখার্জীর উদ্যোগেই ১৯৬৩ সালের ১৬ই আগস্ট হাওড়া হিতৈষী নাম পাল্টে সাপ্তাহিক 'দেশহিতৈষী'তে পরিণত হয় এবং পার্টির সঠিক মতাদর্শ প্রচারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। সংশোধনবাদীদের সাথে পার্টির অভ্যন্তরে লড়াই তীব্র হলে ১৯৬৪ সালে কমিউনিষ্ট পার্টি বিভক্ত হয়ে কমিউনিষ্ট পার্টি মার্কসবাদী (CPIM) গঠিত হয়। কমরেড সমর মুখার্জী স্বাভাবিকভাবেই যোগ দেন CPIM-এ। এই ১৯৬৪ সালেই কমরেড মুখার্জী আবার গ্রেপ্তার হন এবং ছাড়া পান দু বছর পর ১৯৬৬ সালে। এই সময় কাকাবাবু, কমঃ হরেকৃষ্ণ কোঙার, কমঃ প্রমোদ দাশগুপ্ত প্রমুখ নেতৃবৃন্দও জেল থেকে ছাড়া পান।

১৯৬৬ সালে কমরেড মুখার্জী নবগঠিত CPIM পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন এবং পরবর্তী কালে ১৯৭৮ সালে জলন্ধরে অনুষ্ঠিত পার্টি কংগ্রেস থেকে তিনি পলিটবুর্যোর সদস্য নির্বাচিত হন। এরপর ১৯৯২ সালে চেন্নাই পার্টি কংগ্রেস থেকে তিনি পার্টির তৎকালীন সর্বোচ্চ পদ কেন্দ্রীয় কন্ট্রোল কমিশনের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন।

১৯৭০ সালে 'সেন্টার অফ ট্রেড ইউনিয়নস' (CITU) গঠিত হলে কমঃ সমর মুখার্জী সংগঠনের ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন এবং পরবর্তীকালে ১৯৮৩ সালে তিনি CITU এর সর্বভারতীয় সাধারন সম্পাদক রূপে নির্বাচিত হন। ১৯৯১ সাল পর্যন্ত তিনি ঐ পদে ছিলেন। সংসদীয় রাজনীতিতেও সমর মুখার্জী উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে গেছেন। একজন প্রকৃত কমিউনিষ্ট হিসেবে বুর্জোয়া সংসদকে কিভাবে ব্যবহার করতে হয় তিনি সেই শিক্ষা রেখে গেছেন। সমর মুখার্জী তিনটি পর্যায়ে লোকসভার সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন যথাক্রমে ১৯৭১ সালের মার্চ থেকে ১৯৭৭ সালের জানুয়ারী, ১৯৭৭ সালের মার্চ থেকে ১৯৭৯ সালের আগষ্ট মাস এবং ১৯৮০ সালের জানুয়ারী থেকে ১৯৮৪ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত। তিনবারই তিনি হাওড়া লোকসভা কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত হয়েছিলেন।

১৯৭৭ সাল থেকে ১৯৮৪ সাল পর্যন্ত তিনি লোকসভায় সিপিআইএম দলের নেতা ছিলেন। পরে ১৯৮৬ সাল থেকে

১৯৯৩ সাল পর্যন্ত দু দফায় তিনি রাজ্যসভার সদস্য ছিলেন এবং রাজ্যসভাতেও দলের নেতা রূপে কাজ করেছেন। ১৯৭৪ সালে ঐতিহাসিক রেল ধর্মঘট চলাকালীন ইন্দিরা গান্ধী সরকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাবের ওপর আলোচনায় সমর মুখার্জী রেল শ্রমিকদের আন্দোলনের দাবিদাওয়া তুলে ধরে এবং সরকারের দমন পীড়নের প্রতিবাদ করে ঐতিহাসিক ভাষণ দিয়েছিলেন। ঐতিহাসিক রেল ধর্মঘটের মূল্যায়ন প্রসঙ্গে জননেতা কমঃ জ্যোতি বসু তার লেখা 'যতদূর মনে পড়ে' গ্রন্থে লিখেছেন ''রেল ধর্মঘটের অন্যতম নেতা, লোকসভায় সিপিআইএম এর লীডার সমর মুখার্জী-এক বিবৃতিতে বলেন, 'ধর্মঘট চালিয়ে যাবার মত পরিস্থিতি ছিল। ঐক্যবদ্ধভাবে ও দৃঢ়তার সঙ্গে ধর্মঘট চালিয়ে যেতে পারলে সরকারকে আলোচনায় বসতে বাধ্য করানো যেত'। পরবর্তীকালে ইন্দিরা গান্ধীর স্বৈরতান্ত্রিক জরুরী অবস্থার শাষনের বিরুদ্ধে তাঁর 'গরিবী হঠাও' স্লোগানের অবাস্তবতাকে সমর মুখার্জী তথ্যের সাহায্যে তীক্ষ্ণভাবে একজন কমিউনিষ্ট হিসেবে আক্রমণ করেছিলেন। ইন্দিরা গান্ধীর সাথে তীব্র মতবিরোধ থাকলেও শ্রীমতী গান্ধীও প্রয়োজনে তার পরামর্শ নিতেন এবং ১৯৭৩ সালে ফিদেল কাস্ত্রো দিল্লীতে এলে শ্রীমতী গান্ধীই চেয়ার টেনে কমরেড মুখার্জীকে ফিদেল এর সাথে আলোচনা চালিয়ে যেতে বলেন। কমরেড সমর মুখার্জী দলমত নির্বিশেষে সকলেরই শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন।

কমরেড সমর মুখার্জী বিভিন্ন দেশে একাধিকবার সফর করেছেন। কখনও সংসদীয় দলের প্রতিনিধি হিসেবে। কখনও পার্টির প্রতিনিধি হিসেবে তিনি সোভিয়েত, চীন, কোরিয়া, ভিয়েতনাম, জাপান, আফগানিস্তান, বাংলাদেশ, ফ্রান্স, জার্মানি, কিউবা, পোল্যান্ড, যুগোস্লোভিয়া প্রভৃতি দেশ সফর করেছেন। সে সব দেশের পার্টি নেতাদের সাথে, রাষ্ট্র নেতাদের সাথে মত বিনিময় করেছেন। ১৯৭৭ সালে প্যারিসে শান্তি সম্মেলনে প্যালেস্তাইন সমস্যা নিয়ে আলোচনার জন্য যে কমিশন গঠিত হয়েছিল, কমরেড সমর মুখার্জী সেই কমিশনের চেয়ারম্যান নিযুক্ত হয়েছিলেন। ১৯৮২ সালে কিউবার হাভানাতে অনুষ্ঠিত দশম বিশ্ব ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসে তিনি দীর্ঘ ভাষণে ভারতের শ্রমিক শ্রেণীর পক্ষ থেকে বিশ্বের শ্রমিক শ্রেণীর প্রতি সংহতি জ্ঞাপন করেন।

বর্তমান শ্রমিক নেতা ও রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী শ্যামল চক্রবর্ত্তী লিখেছেন, ''বিপিএসএফ এ ভাঙনের পর, আমরা কয়েকজন সমরদার পরামর্শ অনুযায়ীই কাজ করেছিলাম। সেই মতামত ও পরামর্শগুলিই পরবর্তীকালে ছাত্র ফ্রন্ট গড়ে তোলার কাজে প্রধান ভূমিকা নিয়েছিল। সমরদাই ছাত্র ফেডারেশনের পতাকায় 'স্বাধীনতা, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র' যোগ করেছিলেন এবং এটি সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধও লিখেছিলেন ছাত্র ফেডারেশনের মুখপত্রে। সেই সময়কার ছাত্র-যুব আন্দোলনের নেতা হিসেবে ছিলাম আমি, সুভাষ চক্রবর্তী বিমান বসু, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য্য, দীনেশ মজুমদার এবং অনিল বিশ্বাস। সমরদার দেখানো পথই অনেক বেশী গ্রহণযোগ্য ছিল''। উল্লেখ্য ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত ছাত্র-যুব ফ্রন্টের দায়িত্বে ছিলেন কমরেড সমর মুখার্জী, পরবর্তীকালে ঐ দায়িত্ব ন্যস্ত হয় কমরেড প্রমোদ দাশগুপ্তের হাতে।

কমরেড সমর মুখার্জীকে বরাবরই খুব ভালবাসতেন কমঃ বি টি রনদিভে এবং কমঃ এ কে গোপালন। কমঃ গোপালন ১৯৭৫ সালে একটি ব্যক্তিগত চিঠিতে কমঃ সমর মুখার্জীকে লিখেছেন ঃ 'প্রথমই লোকসভায় তোমার চমৎকার ভাষণের জন্য অভিনন্দন জানাই। আমি মনেকরি আমার অনুপস্থিতিটাই শুভ। তুমি শুধু এখানকার নেতাই নও, লোকসভার অধিবেশন সমাপ্ত পর্যন্ত তুমিই নেতা। আর তোমাকে একটা সুপারিশ করছি যে, সুশীলার মতই একজন ভাল কমরেডকে বিবাহ করলে তোমার বৃদ্ধ বয়সে খুবই সাহায্য হবে। তুমি যে বরাবরই বর্তমানের মত শক্ত সমর্থ স্বাস্থ্যবান থাকবে, এমন ভেবো না!'

শ্রদ্ধেয় জননেতা কমঃ জ্যোতি বসুর কথায় কমঃ সমর মুখার্জী হলেন 'গড্‌স ওন ম্যান' অর্থাৎ প্রকৃত একজন সম্পূর্ণ মানুষ এবং একজন আদর্শ কমিউনিষ্ট। জ্যোতি বসু লিখে গেছেন, 'কমঃ সমর মুখার্জী' জীবনাদর্শকেই বর্তমান তরুন প্রজন্মের অনুসরণ করা উচিত।'

অনন্য সাধারণ এই মানুষটির জীবন ও কর্মকান্ড বিপ্লবী আন্দোলনের প্রেরণা স্থল। শ্রমিক শ্রেণী ও তাদের সহযোগী অংশকে সংগঠিত করে বিপ্লবী চেতনায় শানিত করে, বিপ্লবের যোগ্য অগ্রণী বাহিনী হিসেবে গড়ে তোলার কাজকে তিনি সর্বদা অগ্রাধিকার দিয়েছেন। পার্টির প্রয়োজনে সর্বস্ব ত্যাগ করেছেন। ১৯৪২ সাল থেকেই তিনি পার্টি কমিউনে, প্রথমে হাওড়ায় এবং পরবর্তীকালে দিলখুসা স্ট্রীটে। বিগত ৭ই নভেম্বর, ২০১২ তে ১০০ বছরের সংগ্রামী জীবন অতিক্রান্ত করেও তিনি সেই পার্টি কমিউনে। শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সমাজতন্ত্রের মতবাদকে অবলম্বন করে সমগ্র জীবনব্যাপি রাজনৈতিক দূরদর্শিতা, সহমর্মিতা, জনগনের জীবনের সমস্যা নিয়ে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে জনগনকে সংগ্রামের ধারায় যুক্ত করার ক্ষেত্রে কমরেড সমর মুখার্জীর জীবনাদর্শ আমাদের কাছে শিক্ষনীয়। সুস্থ থাকুন ভাল থাকুন—লাল সেলাম কমরেড সমর মুখার্জী।।

# বাৎসরিক অনুষ্ঠান ২০১১

নৃত্যরসভঙ্গিমা

# বাৎসরিক অনুষ্ঠান

## ২০১১

নাটক

## ভূতের বরে

স্থায়ী বিভাগ

# বিবেকানন্দ ধ্যানে-বিজ্ঞানে — 'সার্ধশতবর্ষে'

জগন্নাথ রায়

লেখনীর সূত্রপাতে পাঠককুলকে জানাই মনীষীদের সম্বন্ধে কলম ধরার মতো বিশেষ দক্ষতা আমার নেই, তবুও একবার *সাঁকো* পত্রিকায় 'বিদ্যাসাগর ও বহমান মেদিনীপুর' নামক লেখাটি লিখেছিলাম। এবার আর এক মনীষী 'বিবেকানন্দ'-এর সার্ধশতবর্ষ উপলক্ষে কিঞ্চিৎ লেখার প্রবণতা মাথায় ঘুরপাক খেল কেন জানি না! তবুও শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস-র প্রিয় শিষ্য সাহসী, সত্যবাদী, মানবসেবী, জ্ঞানী, নবভারতের স্রষ্টা, যৌবনের দিব্যজোতি, পৌরুষত্বের দিব্যপ্রতীক ক্রান্তদর্শী সন্ন্যাসী—বিবেকানন্দের সার্ধশতবর্ষে স্মৃতিচারণ করতে বসে আমার ছেলেবেলার কিছু স্মৃতিগাথা কথা মনের দরজায় কড়া নাড়ছে, তা দিয়েই শুরু করছি। প্রাইমারি স্কুলের গণ্ডি অতিক্রম করে মাধ্যমিকের দোড়গোড়ায় যে স্কুলে ভর্তি হয়েছিলাম তার নাম—'ছত্রি বিবেকানন্দ বিদ্যাভবন'—এই স্কুলটির Founder Member আমার স্বর্গীয় জেঠামশাই এবং ঐ স্কুলের ইংরাজির শিক্ষক ছিলেন আমার বড়দা। দাদার হাত ধরে প্রথম এই স্কুলের আঙিনায় প্রবেশ করে দেখেছিলাম যে স্কুলটিতে বিবেকানন্দ সম্বন্ধে অনেক মূল্যবান বক্তব্য তুলে ধরা হয়েছে। তা দেখে দাদাকে প্রশ্ন করেছিলাম স্কুলটির নামের মধ্যে 'বিবেকানন্দ' এল কেন? বড়দা সহাস্যে উত্তর দিয়েছিলেন, জেঠামশাই, বিবেকানন্দের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে নামকরণ করেছেন। একবার স্কুলে ছবি আঁকা প্রতিযোগিতার প্রথম স্থান অধিকার করে পুরস্কার হিসাবে যে বইটি পেয়েছিলাম তার নাম 'ছবিতে বিবেকানন্দ'। মন দিয়ে বইটি পড়ে ছিলাম। এছাড়া আমার জেঠিমার নামে আমাদের বাড়িতে একটা গ্রন্থাগার ছিল। সেই গ্রন্থাগারে বিবেকানন্দের সম্বন্ধে অনেক বই ছিল, প্রায় সবকটা পড়েছিলাম। যাইহোক, এইসব প্রেক্ষাপটের পরে, বিবেকানন্দের ধ্যান-ধারণার উপর আমার উৎসাহ দিনে দিনে বাড়তে থাকল। অবশেষে আজকে এই মাহেন্দ্রক্ষণে লিখতে বসেছি সেই ব্যক্তিত্বের সম্বন্ধে যিনি বলেছিলেন—If one religion be true, Then all others also must be true। সর্বধর্মের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ছিল অকৃত্রিম। তিনি জানতেন বেদান্ত হল সভ্যতার অন্যতম শক্তি। সকল ধর্মমতের ভিত্তি হল এই বেদান্ত। 'ঈশ্বর' নামক যে অনন্ততত্ত্ব আমাদের মধ্যে রূপায়িত হয়েছেন তিনিই বেদান্তের প্রতিপাদ্য। বিবেকানন্দ ধর্ম সম্বন্ধে বহু ব্যাখ্যা করেছেন। ১৮৯৩ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর শিকাগো শহরে বিশ্বধর্ম সম্মেলনে হিন্দুধর্মের যুক্তিগ্রাহ্য তত্ত্বসহ বৈজ্ঞানিক চেতনা বোধের ভিত্তিতে ধর্মের বিভিন্ন পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করে পৃথিবীর সব ধর্মের পথিকৃৎ কুশীলবদের বাহবা কুড়িয়ে ভারতের আত্মবিকাশের পথকে প্রশস্ত করেছিলেন। আমাউরি ডি রেইন কোর্ট ১৯৮১ সালে তাঁর প্রকাশিত আধুনিক পদার্থবিদ্যাও বেদান্তের সমন্বয়ে লেখা—'The Eve of Shiva' নামক গ্রন্থে লিখেছেন: বিবেকানন্দ ও রামকৃষ্ণ এ যুগে সর্বপ্রথম ধর্মকে ব্যাখ্যা করেছেন আধুনিক পদার্থ বিজ্ঞানের ভাষায়। এতে ধর্মের কোনো অঙ্গহানি হয়নি বরং সর্বধর্মের সার অতীন্দ্রিয়বাদ (Mysticism)-এর সাথে আধুনিক পদাথবিদ্যার (Modern Physics) সর্বশেষ আবিষ্কারগুলির এক অদ্ভুত সাদৃশ্য রয়েছে। এছাড়া মাইকেল টেলবট ১৯৮০ সালে তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থ 'মিস্টিসিজম্ (Mysticism) অ্যান্ড নিউ ফিজিক্স'-এ বর্ণনা করেছেন যে, বিবেকানন্দের জ্ঞানযোগে উল্লিখিত দেশ কাল-কারণ (Space-Time-Causation)-কে আপেক্ষিক তত্ত্বের (Relativity) সাথে তুলনা করা যায় যা আজকের কোয়ান্টাম থিওরির (Quantum Theory) মেরুদণ্ড। বিবেকানন্দ একদা বিজ্ঞানের অন্তঃস্থলে গিয়ে বিজ্ঞানীদের দরবারে প্রশ্ন তুলে দিয়েছিলেন যে, পদার্থ বা প্রকৃতি কেন (Why) সৃষ্টি হল? কী অদ্ভুত বিজ্ঞানমনস্ক ছিলেন এই মহামানব বিবেকানন্দ, তার প্রমাণ পাওয়া যায় আজকের পৃথিবীতে সর্বশ্রেষ্ঠ জ্যোতির্বিজ্ঞানী স্টিফেন হকিং তাঁর রচিত 'A Brief History of Time'-এ পরিষ্কার ভাষায় বিবেকানন্দের 'Why' কে স্বীকার করে লিখেছেন যে, এতদিন বিজ্ঞানীরা 'What' নিয়ে গবেষণা করেছেন কিন্তু বর্তমান বিশ্বে এখন সময় এসেছে প্রকৃতির 'Why' কে নিয়ে গবেষণা করাব। বিবেকানন্দ ধর্মচর্চাকে কোন্ মাত্রায় নিয়ে গিয়েছিলেন এবং তার ধ্যান-ধারণার শিকড় কত গভীরে, মনের অন্তঃস্থলে প্রবেশ করেছিল তা ভাষায় প্রকাশ করার মতো বুদ্ধি আমার নেই। বিজ্ঞানীরা তাদের বিজ্ঞানের ভাষায় এই অনন্ত, কর্মযোগী জ্ঞানী পুরুষের ধ্যান-ধারণাকে স্বীকার করেছেন বারে বারে। তিনি শুধু ধর্মপ্রাণ ছিলেন না, তিনি ছিলেন মহান

কর্মযোগী—তাইতে তিনি বলেছেন—

ওঠো, জাগো, যতদিন না লক্ষে পৌঁছিতেছ
ততদিন নিশ্চিন্তে থাকিও না।
ওঠো, আর একবার ওঠো, ত্যাগ ব্যতীত
কিছুই হইতে পারে না।
অন্যকে যদি সাহায্য করিতে চাও
তবে তোমার নিজের অহংকে
বিসর্জন দিতে হইবে।।

কর্মযোগী এই সন্ন্যাসী কর্মযোগে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন—Karmayoga is attaining through unselfish work of the Freedom which is the goal of all human nature. Every selfish action, therefore retards our reaching the goal, and every unselfish action takes us towards the goal–that which is selfish is immoral and that which is unselfish is moral.–আমার মতে উক্তিটির নির্যাস হল স্বার্থমগ্ন মানুষ লক্ষভ্রষ্ট হয় আর স্বার্থত্যাগী মানুষ লক্ষে অবিচল থাকে। স্বামী বিবেকানন্দের ধ্যান-ধারণা, কার্যকারিতা ছিল বহুমুখী। তিনি ছিলেন একাধারে ধার্মিক, স্নেহবৎসল প্রাণ, কর্মবীর, যোগী, বীর সন্ন্যাসী, মানবপ্রেমী, দার্শনিক, জ্ঞানী, ক্রান্তদর্শী, আধ্যাত্মিক আবার অপর দিকে ছিলেন যৌবনের প্রতীক, নব ভারতের জাগ্রত সেবক, ভবিষ্যৎ বক্তা, দয়ালু, পবিত্রতার প্রতিমূর্তি, বাস্তববাদী, তত্ত্বজ্ঞানী ও বড়মাপের বিজ্ঞান মনস্ক দার্শনিক ব্যক্তিত্বের অধিকারী। তাঁর অমূল্যসম্পদ বাণীতে তিনি বলেছেন—যে ধর্ম কেবল কথায় পর্যবসিত তা লাভ করা অতি সহজ, যে কেহ উহা লাভ করিতে পারে। কিন্তু আমরা চাই কর্মে পরিণত ধর্ম, এর থেকে পরিষ্কার ধারণার উপলব্ধি হয় যে, তিনি শুধু ধর্ম নিয়ে চর্চা করতেন না, ধর্মকে কর্মের সাথে মিলন ঘটিয়ে মানুষকে কর্মযোগী করে তুলতে চেয়েছেন। তাঁর রচিত প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য 'কর্মযোগ গ্রন্থ' বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ রূপে আজও বিবেচিত হয়। কর্মযোগী এই মহান প্রবক্তা ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দে ২৩শে নভেম্বর লন্ডনে 'জ্ঞান ও কর্ম' সম্বন্ধে ভাষণ দিয়ে মন জয় করেন। ১৯০০ খ্রিস্টাব্দের ৪ঠা জানুয়ারি ক্যালিফোর্নিয়ার লস্ এঞ্জেলেসে 'কর্ম ও তার রহস্য' সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করেন। ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে ২০শে মার্চ কলকাতার বাগবাজারে 'স্বার্থরহিত কর্ম' সম্বন্ধে বিভিন্ন দিক ব্যাখ্যা করেন এবং তাঁর বহুমুখী প্রতিভার তরঙ্গগুলি মানব কল্যাণে বিলিয়ে দেন। কর্মই ধর্ম, কর্মই উপাসনা, কর্মই আদর্শ, কর্মই মুক্তি,—আমরা জানি মানুষ কর্মের মধ্য দিয়ে যুগ যুগ ধরে বেঁচে থাকে, এমনই এক জগৎ সিদ্ধ ব্যক্তিত্ব হলেন— 'স্বামী বিবেকানন্দ'।

ধ্যানমগ্ন বিবেকানন্দ তাঁর সঞ্জাত শক্তি দ্বারা আত্মার উপর প্রভাব ফেলে, মনকে সংযম করে, জ্ঞানের পরিধিকে বাড়িয়ে ঈশ্বরের অনন্ত শক্তিকে ছুঁতে পেরেছিলেন। বোধহয় সেই কারণে তিনি বলেছেন, ধ্যান হল সঞ্জাতশক্তি, ধ্যান আত্মার উপর প্রভাব ফেলে, মনকে সংযম করে, জ্ঞানের পরিধিকে বাড়ায় ও ঈশ্বর নামক শক্তিকে অনায়াসে ছুঁতে পারে। আজ এক শতাব্দী পরেও বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে ধ্যানের এরূপ ফলের সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে। ২০০১ সালে পেন্সিলভ্যানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে নিউক্লিয়ার মেডিসিন বিভাগের বৈজ্ঞানিক Dr. Andrew Newburg গবেষণার দ্বারা প্রমাণ করেছেন যে, গভীর ধ্যানের সময় মানুষ অনন্তকে স্পর্শ করতে পারে যার অপর নাম—God। এটি একটি অতীন্দ্রিয় অনুভূতি যা Single photon Emission Computed Tomography ক্যামেরার সাহায্যে TV'র পর্দায় লাল ও হলুদ রং এর বিস্ফোরণ ধরা পড়ে সাধারণ কর্মরত অবস্থায়। কিন্তু যখন কর্মী মানুষ ধীরে ধীরে ধ্যানে ডুবে যায় তখন TV'র পর্দায় লাল ও হলুদ রং ক্রমে শান্ত সবুজ ও নীল হয় (Cool green and blue)। এই অসীমের চেতনাই—অতীন্দ্রিয় অনুভূতি যা এক প্রকার—''আত্মানুভূতি''। ''এই মহামানবের সাগর তীরে''—বিজ্ঞান যে কত গভীরে শিকড় গেড়েছিল তা আমার মতো এক বিজ্ঞান সম্বন্ধে নির্বোধ ব্যক্তির কাছেও জলের মতো পরিষ্কার হল যখন ২০১২ সালের ৪ঠা জুলাই হিগ্স বোসন কণার আবিষ্কার ঘোষিত হল—'ঈশ্বর কণা' সার্ন-এর পরীক্ষাগারে প্রথম-হিগ্স বোসন, ঈশ্বর কণার আবিষ্কার বহু বছরের শ্রমের ফলে সফলতা লাভ করেছে। তখন আমার সারা শরীরে শিহরণ জেগে উঠল। এক অদ্ভুত আনন্দে মাথা নত হল সেই শৌর্য পুরুষ, ভবিষ্যৎ বক্তা, অনন্য বিজ্ঞান মনস্কের পদযুগল স্মরণে কারণ যিনি বহু আগে বলেছিলেন সব পদার্থের 'ভর' আছে। কিন্তু 'ভর' জোগায় কে? এই 'ভর' জোগায় 'ঈশ্বর কণা' প্রত্যেক জিনিসের মধ্যে ভগবানকে পাওয়া যায় বা ভগবান আছেন। অদৃশ্য এক অনন্ত শক্তি—Feel the mind with the highest thoughts, hear them day after day, think them month after month, the Ideal of man is to see God in everything অর্থাৎ পৃথিবীতে অজস্র কণা আছে, প্রতিটি জিনিসের মধ্যে যে 'ভর' আছে তা 'ঈশ্বর কণা থেকে প্রাপ্ত হয়।' ছেলেবেলায় বিবেকানন্দ সম্বন্ধে গল্পে পড়েছিলাম, বিবেকান্দ সপ্তর্ষি'র এক ঋষির অবতার হিসাবে ইহ জগতে এসেছেন। অনুমান বা কাকতালীয় হতে পারে তাঁর বলা ভবিষ্যৎবাণী আজ একবিংশ শতাব্দীতে ও সত্য ও বাস্তবে পরিণত হচ্ছে।

মানুষ হিসাবে বিবেকানন্দ ছিলেন অকৃতদার, দুঃখী

দরিদ্রের হিতাকাঙ্খী, যুব সমাজের মধ্যমণি ও যৌবনের প্রতীক। তাঁর বাণী ও আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়েছেন—যুব সমাজ। তাঁর মানবপ্রেমে গা ভাসিয়ে সেবাযোগী হয়েছেন বহু ব্যক্তিত্ব—ভগিনী নিবেদিতা, স্বামী সদানন্দ, কল্যাণানন্দ। এরূপ অসংখ্য মহাপ্রাণ দেশে ও বিদেশে ছড়িয়ে আছেন বিবেকানন্দের পরম শিষ্য রূপে। বাংলার গণ্ডি ছাড়িয়ে তিনি এদেশের তথা বিশ্বের এক কীর্তিমান পুরুষ। যাঁর জীবনচরিত ছিল শুধুই মানবতায় ভরপুর, কৃষ্টি ছিল ভালোবাসা, সৃষ্টি ছিল সুদুর প্রসারী। চিন্তা ছিল সৎ ও জাগ্রত আছে বাণী এমনই এক মহান মানবকে সার্ধশতবর্ষে জানাই আমার সশ্রদ্ধ শত কোটি প্রণাম। ভালো লাগে যখন শুনি এই গুণবান ব্যক্তিত্বের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে প্রেসিডেন্সি কলেজে তাঁর আবক্ষ মূর্তি বসতে চলেছে। আবার দুঃখে ভারাক্রান্ত হয় আমার মন যখন শুনি রাজনীতির দাবা খেলায় ভোট যুদ্ধে জয়ী হবার জন্য নরেন্দ্র মোদির গুজরাটের রাজনীতিতে প্রবেশ করেছে—বিবেকানন্দের নাম। অথচ দেখুন যাঁর কাছে 'সত্যই' ছিল রাজনীতি আর সারা বিশ্ব ছিল তাঁর 'দেশ' তিনি কিনা রাজনীতির আঙিনায়! লজ্জা বন্ধ হোক, এই মনোবৃত্তিতে প্রস্ফুটিত হোক নতুন দিগন্ত, জাগ্রত হোক যুব-সমাজ যা চেয়েছিলেন স্বামীজি। তবেই প্রকৃত শ্রদ্ধার্ঘ অর্পণ করা হবে এই মহা মানবকে। তাই আমার হৃদয় গভীরে নাড়া দেয়—

বিবেক-আনন্দ—''বিবেকানন্দ''
অম্লান তব বানী
আজও জাগ্রত।।

তুমি চেয়েছিলে—
জাগুক ভারতের 'যুবসত্তা'।
জেগেছে! তবু মোছেনি—
স্বার্থপরতা, হীনতা ও দীনতা।।

আবার এসো তুমি,
নবরূপে এই ধরাধামে।
সাধনার মন্ত্র দাও
যুবশক্তি 'মনে'।।

জাগাও আবার চেতনা,—
মনোবল আর দৃঢ়তা
দুর্বার হোক তব মন্ত্রে
যুবশক্তি দেবতা।।

স্বপ্নের ভারত হোক সুন্দর,
মুছে হীনতা ও দীনতা,
বিশ্বে থাকুক শীর্ষে—
প্রণমি তোমায়—'সার্ধশতবর্ষে'।।

---

## মন কাঁদে (কবি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় স্মরণে)

**সুব্রত ভট্টাচার্য**

সুনীল মিশে যায়, মিলিয়ে যায় সুনীলে—
হয় সাগরে বা দূরে আকাশে,
এবারে যেও তোমার দিকশূন্যপুরে,
দিগন্ত পারে—নিও তোমার নীরার হাত
তোমার সেই হাতে, যা কোনো পাপ করে নি।
আজ কাঁদি, তোমার কলম আর আমাদের
মননে নূতন ভাবনা জোগাবে না বলে,
যৌবনই জীবন বা
জীবনময় যৌবন থাকতে
আর শেখাবে না তুমি।
কত সহজে যে মানুষের কাছে আসা ধরা দেওয়া
আবার চলে গিয়ে বুঝিতে দেওয়া—
তোমার মগজের ভাবনার জোর
আর সাধারণের মতো নয়,
যে পারে পড়তে, ভেঙে সব পোশাকি নিয়ম—
যা হবে শুধুই মানুষের।
তার মনের, ভাবনার ভাষার।
কতবার তোমার লেখার গভীরে গিয়েছি
কতবার বা তোমার লেখা আমার গভীরে—
যেন তুমিই আমি বা আমিই তুমি—
সব মিলে একাকার কিন্তু একত্রিত।
দিগন্ত পেরোনো সূর্য উঠবে, ডুববে
তুমিও থাকবে ছাপার অক্ষরে, আলোচনায়, ভাবনায়
শুধু আর পাবো না তোমার লেখা—
স্বার্থপরের মতো এই কষ্টটা কখনও কমবে না।।

---

# স্মরণীয়া

**ডাঃ তমাল দেব**

দিনটা ছিল ২৩শে জুলাই, সোমবার। এক কিংবদন্তীপ্রতিম আজীবন বিপ্লবী সমাজসেবী চিকিৎসকের জীবনাবসান ঘটল। ১৯শে জুলাই হঠাৎ হৃদযন্ত্রের বৈকল্য হওয়ায় ভর্তি হয়েছিলেন কানপুরের এক বেসরকারি নার্সিংহোমে। কিন্তু ডাক্তারদের সব চেষ্টার ব্যর্থ করে তিনি চলে গেলেন। বয়স হয়েছিল ৯৭। তাঁর দেহদান করে গিয়েছিলেন ডাক্তারি ছাত্রদের শিক্ষার জন্য ও চোখ দান করে গিয়েছিলেন অন্ধ মানুষের দৃষ্টি ফেরানোর জন্য। তাই তাঁর দেহ শ্মশানে দাহ করা হয়নি। স্থান পেল মেডিক্যাল কলেজে। নার্সিংহোমে ভর্তির আগের দিন পর্যন্ত তিনি বিনা পারিশ্রমিকে রুগি দেখেছেন এবং মৃত্যুর পরে তাঁর সমাজসেবী প্রতিজ্ঞা বাস্তবায়িত হয়েছে। তিনি হলেন ক্যাপ্টেন ডা. লক্ষ্মী সেহগাল।

১৯১৪ সালের ২৪শে অক্টোবর ক্যাপ্টেন লক্ষ্মীর জন্ম হয় মাদ্রাজে (চেন্নাই)। বাবা ড. এস. স্বামীনাথন ছিলেন মাদ্রাজ হাইকোর্টের প্রতিষ্ঠিত আইনজীবী আর মা এ. ভি. আম্মুকুট্টি ছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবী। কেরালা থেকে আসা স্বামীনাথন নিজেকে মাদ্রাজে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন এবং বিয়ে করেছিলেন অন্য জাতের আম্মুকুট্টিকে। তাই ক্যাপ্টেন লক্ষ্মী ছোটোবেলা থেকেই তৈরি হয়েছিলেন এক প্রগতিশীল পরিবেশে। স্কুল ও কলেজে বন্ধুবান্ধবদের প্রচলিত অন্ধবিশ্বাস ও জাতপাতের বিরুদ্ধে সওয়াল করতেন। ডাক্তারি পড়তে ভর্তি হলেন মাদ্রাজ মেডিক্যাল কলেজে। ১৯০৮ সালে সম্মানের সঙ্গে ডাক্তারি পাশ করেন এবং পরে ধাত্রীবিদ্যায় DGO ডিপ্লোমা পাশ করেন।

১৯৪০ সালে উনি ও চলে যান সিঙ্গাপুর। সেখানে দরিদ্র প্রবাসী ভারতীয় শ্রমিকদের চিকিৎসার জন্য ক্লিনিক শুরু করেন। ১৯৪২ সালে ব্রিটিশরা জাপানিদের কাছে আত্মসমর্পণের পর প্রচুর আহত সৈনিকদের চিকিৎসা করে সুস্থ করে তোলেন। ১৯৪৩-এ ২রা জুলাই নেতাজী সুভাষচন্দ্র বোস সিঙ্গাপুরে আসেন। ঐ সময় ক্যাপ্টেন লক্ষ্মী আনুষ্ঠানিকভাবে INA (Indian National Army)-তে যোগদান করেন। নেতাজী ক্যাপ্টেন লক্ষ্মীকে রানি ঝাঁসি বাহিনীর নেতৃত্ব দিতে অনুরোধ করেন এবং আজাদ হিন্দ সরকারের মহিলা বিষয়ক দপ্তরের মন্ত্রীপদে নিয়োগ করেন।

INA-র পরাজয়ের পর ক্যাপ্টেন লক্ষ্মী বর্মায় বন্দী হন ব্রিটিশদের হাতে। ১৯৪৬ সালে ওঁকে ভারতবর্ষে ফিরিয়ে আনা হয়।

স্বাধীনতার পর ক্যাপ্টেন লক্ষ্মী স্থায়ীভাবে কানপুরে বসবাস শুরু করেন ও নিজস্ব প্র্যাকটিস চালু করেন। এইখানেই উনি বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন প্রেমকুমার সেহগালের সঙ্গে। প্রেমকুমারও ছিলেন INA-র একজন নেতা ও সুভাষচন্দ্র বোসের ঘনিষ্ঠ সহকর্মী। কিছুদিনের মধ্যেই কানপুর দরিদ্র মহিলাদের মধ্যে নিজেকে তাঁদের বন্ধু ও চিকিৎসক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন। শত শত মহিলা রুগি তাঁর চিকিৎসায় উপকৃত হন। বিনিময়ে তাদের কাছ থেকে পারিশ্রমিক পেতেন নামমাত্র যৎসামান্য।

১৯৭১ সালে যখন শয়ে শয়ে শরণার্থীরা পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিমবাংলায় চলে আসেন। তখন জ্যোতি বসুর আহ্বানে সাড়া দিয়ে ক্যাপ্টেন লক্ষ্মী মাসের পর মাস Peoples Relief Committee-র ত্রাণ শিবিরে কাজ করেন। পশ্চিমবাংলায় কাজ করার অভিজ্ঞতার পর ক্যাপ্টেন লক্ষ্মী সি.পি.আই. (এম) দলে যোগদান করেন। কানপুর শাখার সদস্যা হন ও পরে উত্তরপ্রদেশ রাজ্য কমিটিরও সদস্যা হন। All India Democratic Womens Association-এর Founder Member ও ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়ে তাঁর কর্মক্ষেত্র।

সামাজিক বিপ্লবের চেতনাই ছিল তাঁর আদর্শ এবং এই আদর্শকেই সামনে রেখে সারা জীবন তিনি কাজ করে গেছেন। তাঁর মেয়ে সুভাষিনী আলি এক সক্রিয় রাজনৈতিক কর্মী। আরেক মেয়ে হলেন অনীষা পুরী।

পদ্মবিভূষণ পান ভারত সরকারের কাছে ১৯৯৮-তে। ২০০২ সালে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে তিনি ছিলেন বামপন্থীদের প্রার্থী এ.পি.জে. আব্দুল কালামের বিপরীতে।

তাঁর জীবন, সমস্ত চিকিৎসক সমাজ ও সমাজ কর্মীদের কাছে দৃষ্টান্ত স্বরূপ। তাঁর জীবনাবসান সারা দেশের কাছে এক বিরাট শূন্যতা।

তাই প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং ও উপরাষ্ট্রপতি হামিদ আনসারির কথায় এক হয়ে বলতে হয়—"Nation has lost an icon of liberal values and selfless service."